স্বজন

রমাপদ চৌধুরী

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ়, ১৩৭১

প্রকাশক
কল্যাণব্রত দত্ত
তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মুদ্রক
ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
অবনা প্রিন্টার্স
২৫।৩ তারক চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৫

প্রচ্ছদ-শিল্পী
সত্য চক্রবর্ত্তী

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রিয়বরেষু

(১)

সন্ধ্যায়) সমতলভূমিকে বিদায় দিয়ে চলন্ত ভোরের জানালা খুললেই অবাক হয়ে যাবার মত দৃশ্য।)যেন একটা উত্তাল সমুদ্র অভিশাপে স্তব্ধ হয়ে গেছে, ঢেউ ভাঙা রুক্ষ মাটি আর পাথুরে টিলায়-পাহাড়ে অহল্যা-পাষাণ হয়ে গেছে সারা অঞ্চল।

এ-তল্লাটে ছোট ছোট নানা উপবনে সুখী বাবুরা মাঝে-সাঝে চেঞ্জে আসতেন। শাল মহুয়ার দঙ্গল, এখানে ওখানে বেঁটেখাটো পাহাড়ের ঢেউ, খোলা আকাশের নিসর্গ তো আছেই। উপরন্তু কালো মেয়ে, সস্তা মুর্গী, লাক্ষার গুটি-ধরা কুল আর বাবলার বাগান, জোনায় রাঁচিতে ফলস্। শ্লেট রঙের কালচে পাহাড় আর কালো মানুষের ফাঁকে পুঞ্জীভূত হঠাৎ সবুজ, ঘন সবুজ। অনেক দূরে কোথাও পাহাড়ের কণ্ঠদেশে উঁকি দেয় রোদ্দুরে ঝলমল রূপোর ঝরনা। চেঞ্জার বাবুরা এ-দৃশ্য দেখে দু'দশদিন স্বর্গবাস করে স্মৃতির ভুবন গুটিয়ে নিয়ে ফিরে যেত। সারা অঞ্চল আবার তেমনি শান্ত স্থির অচঞ্চল। এত নিশ্চুপ যে গাছের গুঁড়িতে কাঠপোকার আওয়াজ শোনা যেত।

কিন্তু এ-পথে যেতে যেতে এই ছোট্ট স্টেশন প্লাটফর্মের গায়ে লেখা রাশভারি নামটাও কারো চোখে পড়তো না। চোখে পড়লেও কেউ বড়জোর কৌতুকের গলায় বলে উঠতো, গড় কোথায় রে, একটা উঁচু উঁচুটিবিও তো দেখছি না। ফেরৎ রসিকতায় কেউ বলতো, আছে নিশ্চয়, কাদামাটির দুর্গটুর্গ। রাজা আছে না একজন?

ব্যস, ঐ পর্যন্ত।

বলতে গেলে একেবারে ব্রাত্যভূমি হয়ে অবহেলায় পড়ে ছিল রামগড়। ওদিকে সিল্লি বা টোড়ি, এদিকে গোলা রোড বারলাঙ্গা মায়েল কিংবা সোনডিমরা ধরনের অসংখ্য অন্ত্যজ নামের ভিড়ে হঠাৎ রামগড় নামটা দেখে দু'একজন চমকেও উঠতো। রাজনীতির কল্যাণে একবার নামটা পরিচিত হয়েছিল, তারপর আবার যেমনকার তেমনি।

হঠাৎ একদিন, রাতারাতি, শুধু এই আধা-শহর রামগড়ই নয়, রাঁচি অবধি সারা অঞ্চলই চেহারায় চরিত্রে বদলে গেল। মানচিত্রের গায়ে খুঁজে-পাওয়া-দুষ্কর ছোট ছোট নামগুলো চঞ্চল হয়ে উঠে সব বড় হরফ হয়ে গেল। গুরুত্ব বেড়ে গেল গুরুদাসবাবুরও।

গুরুদাস প্রায় গোটা জীবনটাই কাটিয়ে দিয়েছেন এ লাইনের এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে। কালো কোটের বুকে এক সারি বড় বড় পিতলের বোতাম, এবং সাদা জীনের ঢোলা প্যাণ্ট পরা মাস্টারবাবুকে চেনে না এমন লোক এদিকটায় কমই আছে। এই শান্ত প্রকৃতির ছোপ লেগে বেশ ফর্সা চেহারার গুরুদাসের মুখে একটা বাদামী ছায়া পড়লেও চোখে কেমন এক ধরনের নিরাসক্ত তৃপ্তি। চাকরিতে উন্নতি করার খুব একটা ইচ্ছে বা চেষ্টা ওঁর কখনো ছিল না। দু' পয়সা বাড়তি রোজগারের জন্যে কেউ কেউ বিশেষ স্টেশন বেছে নেয়। ওঁর সেদিকেও কোন আগ্রহ ছিল না। দু'খানা হাত পাখির ডানার মত মেলে দিয়ে আয়েসের কণ্ঠে প্রায়ই বলতেন, বেশ আছি।

তবু চুয়ান্ন বছর বয়সে মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে যাওয়ার পর গুরুদাসের হঠাৎ পদোন্নতি ঘটলো। এ. এস. এম. হিসেবে এই রামগড়েও কয়েকবার রিলিভিং করতে এসেছিলেন। এখন একেবারে খোদ স্টেশনমাস্টার।

—আরে বকশি, তোমাকে তো চিনতেই পারিনি। হেসে দু'হাতে বুকিং ক্লার্ক বকশিকে জড়িয়ে ধরলেন গুরুদাস। তার খাকি ইউনিফর্মসুদ্ধ গোটা শরীরটা।

মুরী গিয়েছিল, নতুন পোশাকে তখনই ট্রেন থেকে নামলো সে।

বণ্ড সই করে ডি. এফ. আইয়ে জয়েন করেছে। আসলে এই স্টেশনেরই বুকিং ক্লার্ক, স্টেশনের গায়ে লাগা রেল কোয়ার্টারেই থাকে। গুরুদাসের কোয়ার্টার থেকে বেশি দূরেও নয়।

বকশি হাসতে হাসতে প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইলো।—ছেলেমেয়ের খবর কি গুরুদাসদা, কবে আসছে।

গুরুদাস সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, তোমাকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু, রীতিমত মিলিটারি মিলিটারি লাগছে।

বকশি কাঁধে আঁটা পিতলের অক্ষর দুটো দেখালো। ইংরেজি আই. ই!

হেসে বললে, ইঞ্জিনিয়ার তো কখনো হতে পারতাম না, এ ব্যাটারা কলমের এক খোঁচায় সবাইকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে দিল। ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার্স। বলে হো হো করে হাসলো বকশি।

তারপর বললে, যাক, কিছু বাড়তি টাকা তো মিলবে, কিছু সুযোগ-সুবিধে।

একটু থেমে বললে, আসল কথা কি জানেন গুরুদাসদা। ওরা তো চতুর্দিকে শুধু ফিফথ কলম আর কুইসলিং দেখছে। কাজ তো সেই একই। আমাদের বেলও আবার খাস সাহেব কোম্পানি, তার ওপর এই মিলিটারিব যুগ। জয়েন না করলে একটু দোষ পেলেই হয়তো চাকরি নট। ভবিষ্যতে প্রমোশনও বন্ধ।

হাসতে হাসতে বললে, আপনিও সই করে দিন। আর কেন।

গুরুদাস শুধু বললেন, ভাবছি।

রাঁচি তখন ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের হেডকোয়ার্টার। নিত্যদিন মিলিটারি স্পেশালের ভিড়। প্যাসেঞ্জারে এক্সপ্রেসেও ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান সৈন্য গিজগিজ করে। ক্যাপ্টেন, মেজর, লেফটেনেণ্ট কর্নেলরা এমন মেজাজ দেখায় যেন রেল কোম্পানিটা ওরাই কিনে নিয়েছে। কখনো সখনো দেখেছেন গুটিকয়েক চীনা মিলিটারি অফিসারও আমেরিকানদের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে রাঁচি চলেছে।

রাঁচি এক্সপ্রেস রাঁচি যেত না। মুরী স্টেশনে চোদ্দ আনা প্যাসেঞ্জার উগরে দিয়ে এই রামগড় বরকাকানার দিকে মুখ ফেরাতো। দু'দশটা দেহাতি প্যাসেঞ্জারের মুখ দেখা যেত, এই অবধি।

হঠাৎ সেই ছোটামুরা জমজমাট হয়ে উঠলো। চঞ্চল হয়ে উঠলো এই নির্বান্ধব রামগড় বরকাকানাও।

প্রথম প্রথম সকলেই ঐ খাকি রঙ দেখলেই গা বাঁচিয়ে চলতো। কিছু ভয়ে, কিছু সম্ভ্রমে। একে সাহেব, তার ওপর মিলিটারি। ব্রিটিশ টমি অথবা অফিসার দেখলে আতঙ্কটা বেশি। কারণ এই তো কিছুদিন আগে একটা লাইন উপড়ে দেওয়া থানা জ্বালানো মুভমেণ্ট হয়ে গেছে সারা দেশ জুড়ে, বড় ছোট মাঝারি সব নেতারা তখন জেলে, থমকে থিতিয়ে গেছে সব আন্দোলন, দিশি মিলিটারির গুলিতেই।

বকশি চলে যেতেই গুরুদাস প্লাটফর্মে পায়চারি করতে করতে ভাবলেন, বড় একা হয়ে যাচ্ছি।

এসে বসলেন নিজের অফিস ঘরটিতে।

শুধু গুরুদাসের নয়, স্টেশনেরও পদোন্নতি ঘটেছে। হল্টেজ বেড়েছে, প্লাটফর্ম বড় হয়েছে। কারণ, রেললাইনের একটা দিক মিলিটারির আওতায়। বিরাট এলাকা জুড়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের ছাউনি। তাছাড়া আছে তিনতলা সমান উঁচু কাঁটাতার আর জালে ঘেরা পি ও ডবলু ক্যাম্প। ইতালিয়ান সৈন্যদের বন্দীশিবির। পি ও ডবলু অর্থাৎ প্রিজনার অফ ওয়ার।

এখন চতুর্দিকে শুধু খাকি পোশাক, খাকি গ্যাবার্ডিনের সৈন্য সৈন্য সৈন্য। তার ওপর এই ডি এফ আই। বাড়তি টাকার লোভে কিংবা চাকরি খোয়াবার ভয়ে রেলের লোকরাও দলে দলে নাম লেখাচ্ছে। বিশেষ কোন তফাৎ নেই, যে যার পোস্টে সেই পুরনো কাজই করে যাবে, শুধু গায়ে খাকি ইউনিফর্ম উঠবে, মাঝে-মধ্যে প্যারেড।

এতখানি বিশ্বস্ত করে তোলার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। মিলিটারি

সাহেবদের রেলের লোকরাও একটু সমীহ করে চলে, ছুটোছুটি করে তাদের জন্যে বার্থ রিজার্ভ করে দেয়, কখনো কখনো পুরো কামরাই। তারপর ইয়াঙ্কি সুরের ধন্যবাদ শুনতে পেলে টি টি সির মুখ খুশিতে গদগদ। সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে বলে, যাই বলো ব্যানার্জি, আমেরিকানগুলো মিশুকে আছে, টমিগুলোর মত নয়। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে কেউ লড়ে যায়, আরে ছ্যা ছ্যা, বেলেল্লার একশেষ, ব্রিটিশ অফিসারগুলো কত রিজার্ভড, কি ডিসিপ্লিন···

গুরুদাস এসে নিজের অফিস ঘরটিতে বসলেন। তারপর খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন পি ও ডবলু ক্যাম্পটার দিকে। তিনতলা বাড়ি সমান উঁচু বেড়া, কাঁটাতার আর জাল দিয়ে ঘেরা একটা বিশাল খাঁচা যেন। তার ভিতবে ক্যামোফ্লাজ করা শ্যাওলা বঙের অসংখ্য খুপরি, দূব থেকে সারি সারি তাঁবুর মত দেখায়। রাইফেল কাঁধে ব্রিটিশ টমির দল টহল দিচ্ছে অবিরত।

এখন কোন ট্রেন নেই। মিলিটারি স্পেশালেরও খবর নেই কোন। তাই একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন। চিন্তা শুধু ইন্দ্র আর নীপার জন্যে।

খবরের কাগজ আসে এখানে অনেক দেরীতে। গুজব পৌঁছে যায় অনেক আগেই। একটু আগে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলে গেল বরকাকানা। যাবার সময় গার্ড রামস্বামা বলে গেল জাপানীরা নাকি কোলকাতায় বোমা ফেলেছে আবার।

গুরুদাস সেজন্যেই বড় চিন্তিত।

ভজনলাল খালাসীব কাজ করে, কি একটা প্রয়োজনে এসে দাঁড়িয়েছিল রতনমণিবাবুর কাছে। রতনমণিকে এখানে সকলেই বলে 'তারবাবু', দিবারাত্র টেলিগ্রাফ যন্ত্রটার সামনে বসে টরে টক্কা করেন, জার্মান সিলভারের ডিবে খুলে পান খান, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলেন, টি ডি আর বলছে ফট্টি-টু আপ নাকি···কখনো বা কাগজে মেসেজ

লেখেন আর টরে টক্কায় প্রশ্ন করেন, কি বললেন ?

খালাসী ভজনলালের গায়েও খাকি ইউনিফর্ম।

ও হঠাৎ তারবাবুকে প্রশ্ন করলে, লড়াইকা কুছ খবর হয় বাবুজী ?

যেন তারবাবু রেলের এই টেলিগ্রাফ যন্ত্রে সব গোপন খবর পেয়ে যাচ্ছেন।

রতনমণি হেসে ফেলে বললেন, লড়াই কোথায় রে বাবা, কেবল তো যাচ্ছে আসছে, ফুর্তি করছে।

তারপর গুরুদাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, হেরে পালাচ্ছে সব জায়গা থেকে, অথচ কাগজ দেখে মনে হয় সারা পৃথিবীটাই যেন জয় করে নিয়েছে ইংরেজরা। কি বলেন গুরুদাসদা।

গুরুদাস আজকাল একটু সাবধানে কথাবার্তা বলেন। উনি নির্বিবাদী মানুষ, শান্তিতে থাকতে চান। কোন্ কথা থেকে কি হয় কে জানে।

একবার ভজনলালের দিকে তাকালেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, একটা যুদ্ধ কোথাও জিতেছে ভাই, চোখের সামনে তার প্রমাণ রয়েছে।

বলে রেল লাইনের ও-প্রান্তের দিকে আঙুল দেখালেন, কাঁটাতার আর জালে ঘেরা পি ও ডবলু ক্যাম্পের দিকে।

খালাসী ভজনলালও হেসে ফেলল ওঁর কথায়।

আর গুরুদাস অন্যমনস্ক ভাবে সেদিকেই তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন, বন্দী ইটালিয়ান সৈন্যদের একটা বিরাট লাইন খাঁচাটার ভেতর। হাতে কলাই করা মগ আর থালা নিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে ডুরে পাজামা, আর ডোরাকাটা জামা। জেলখানার কয়েদীদের মত। ডিম পাঁউরুটি কফি নিচ্ছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছে দু'একজন, কারো বা হাতে কাঁধে ব্যাণ্ডেজ।

না, জেলখানার কয়েদী নয়। ওটা স্লিপিং স্যুট; রাত্রে পরে ঘুমোয়। অন্য সময়ে দেখেছেন, ইটালিয়ানদের নিজের নিজের

ইউনিফর্মই পরে থাকে। অন্য রকম। খাকি রঙটাও অন্য।

রতনমণিও হয়তো ওদিকেই তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, দেবতুল্য।

কথাটা খুব মনঃপূত হল গুরুদাসের। —ঠিক বলেছেন।

গুরুদাস এমনিতেই একটু জার্মানির ভক্ত। ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ইটালিয়ানরা কোন কাজের নয়। অর্থাৎ ইংরেজদের তেমন বিপর্যস্ত করতে পারেনি।

তবু এক একদিন ঐ প্রিজনারদের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বড় মায়া হয়। আঠারো উনিশ কুড়ি বছরের তাজা তরুণ সুন্দর সুন্দর মুখ। নিজের মনেই বলেন, কেন মরতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলি।

একদিন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ডের সামনেই ওদের জন্যে মায়া দেখিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর থেকে সাবধান হয়ে গেছেন। লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দুটো শব্দ উচ্চারণ করেছিল। —ড্যামন ফ্যাসিস্ট।

কথাটা মাঝে মাঝেই শোনেন। কেমন ধোঁয়াটে লাগে। বুঝতে পারেন না।

উনি অতশত বোঝেন না। ইংরেজরা আমাদের স্বাধীনতা দিচ্ছে না, নেতাদের জেলে ভরে রেখেছে। জার্মানি আর ইটালি তাদের শত্রু। অতএব এরা যদি ইংরেজদের একটু শিক্ষা দেয় মন্দ কি।

বকশি বলেছিল, জার্মানি-টার্মানি লাগবে না, দেখবেন জাপানই ওদের শায়েস্তা করে দেবে।

শুনে গুরুদাসের ভালই লেগেছিল। কিন্তু কোলকাতায় বোমা পড়েছে শুনেই চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। কারণ ছেলে ইন্দ্র আর মেয়ে নীপা, দু'জনেই সেখানে। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে।

আদরের মেয়ে নীপা। তার বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে জামশেদ-পুরের স্কুল বোর্ডিংয়ে। এখন কোলকাতার কলেজ হস্টেলে। ছেলে ইন্দ্র, সে-ও মেডিকেল পড়ছে। ছেলেমেয়েরা সেই কোন্ ছোটবেলা

থেকে বাবা-মার কাছ থেকে দূরে দূরে মানুষ। তাই মায়াটাও বেশি। গরমের কিংবা পুজোর ছুটিতে যখন এসে থাকে, গুরুদাসের দিকে তাকালেই মনে হয় ওঁর মনের ভেতরটা যেন চন্দন-পিঁড়িতে ঘষা শ্বেত-চন্দনের মত নরম আর ঠাণ্ডা আর সুগন্ধে ভরা।

সারাটা জীবনই ওঁর বদলির চাকরি, তাই বোর্ডিং হস্টেলেই কেটেছে ইন্দ্র আর নীপার।

এখন ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে হয়।

বোমা পড়েছে গুজব রাষ্ট্র হতে না হতে একে একে সকলেই এসে বলে গেল, ছেলেমেয়েদের চলে আসতে টেলিগ্রাম করে দিন। কেউ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কোন খবর পেয়েছেন গুরুদাসদা।

আসলে এই সব ছোট জায়গায় সকলে মিলে একটা পরিবার যেন। উনি স্টেশন মাস্টার, তাই কোয়ার্টারটা বড়। এবং আর সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। তারপর দু' সারি কোয়ার্টার—বুকিং ক্লার্ক, ব্লক ইনসপেক্টর, তারবাবু এবং আরো অনেকে। ওদিকে পানিপাঁড়ে ব্রজকিশোর, অর্থাৎ বিরজু ছাড়াও খালাসীদের কেবিনম্যানের এক ঘরের খুপরি। দু' এক বছর বাদে বাদেই বদলি লেগে আছে। যে নতুন আসে দু'দিনেই সে-ও একই পরিবার হয়ে যায়।

ওঁরা তো এখন আরো একজোট, মিলিটারির আনাগোনা বেড়ে গেছে বলেই। নিত্যদিন ওদের স্পেশাল ট্রেন আসছে, চলে যাচ্ছে। সৈন্যরাও। কেন আসে, কোথায় যায়, তা অবশ্য জানতে পারেন না গুরুদাস।

প্রথম প্রথম তো চারুবালা একেবারে সিঁটিয়ে থাকতেন, জানালাও খুলতে চাইতেন না। এখন সবই স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

আসলে কোয়ার্টারের এদিকটায়, এমন কি ঐ শনিচারীর হাট অবধি একটা সীমারেখা টানা আছে, বোর্ড ঝুলছে। মিলিটারির লোক এদিকে আসতে পায় না। কেউ এসে পড়লে হাতে এম পি ব্যাজ লাগানো মিলিটারি পুলিস ধমক দেয়। ওদের দেখলেই সবাই তটস্থ।

ক্যাপ্টেন বেল আর মেজর হুইটলিকেও এখন আর গুরুদাসের তেমন ভয় করে না। ওরা আসে, ট্রেন থেকে সোলজারদের নামা-ওঠা তদারক করে, চলে যায়। কোন কোনদিন ওঁদের সঙ্গে একটু রসিকতাও করে। ভাঁড়ের চা, তাও খেয়েছে একদিন।

একদিন রাত্রে দূরের পাহাড়ে আগুন লেগেছে। বনের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। গরমের সময় প্রায়ই হয়। গুরুদাসের অবশ্য ধারণা, বনোয়ারীর লোকরা আগুন লাগিয়ে দেয়। কাঠকয়লার চাহিদা বেড়েছে, তাই আগুন ধরিয়ে দিয়ে কাঠকয়লা চালান দেয়।

বনোয়ারী কি যে চালান দেয় না বোঝা মুশকিল। আলপিন মেলে না, আসছে না বিলেত থেকে। তাই অফিসে অফিসে বাবলা কাঁটাও সাপ্লাই দেয়।

রাত্রের ট্রেন তখনো আসে নি।

গুরুদাস একদিন লক্ষ্য করলেন ক্যাপ্টেন বেল আর তার দলবল অবাক হয়ে দেখছে দূরের পাহাড়টার দিকে। আগুন-লাগা বনের দিকে।

গুরুদাসকে দেখতে পেয়ে খটর খট খটর খট বুটের আওয়াজ তুলে এগিয়ে এলো ক্যাপ্টেন বেল। পাহাড়ের দিকে তর্জনী দেখিয়ে প্রশ্ন করলো, ওটা কি? কোন ইণ্ডিয়ান রিচুয়াল?

গুরুদাস হেসে ফেলে অনেক কষ্টে ওকে বোঝালেন, ওসব কিছু নয়, বনে কেউ আগুন লাগিয়েছে, ফর চারকোল।

ক্যাপ্টেন বেল যেন হতাশ হল। আর তার পর থেকে গুরুদাসদের মধ্যে একটা বাঁধা রসিকতা হয়ে দাঁড়ালো ইণ্ডিয়ান রিচুয়াল কথাটা।

এরই ফাঁকে এক একদিন এক ঝাঁক মেয়ে এসে নামে। ওয়াক। আসলে ডবলু এ সি। উইমেনস অকজিলিয়ারি কোর। ছাই-নীল স্কা[illegible]নফর্ম পরা খাঁটি মেমসাহেব। ওরা কি কাজ করে কিছুই জানেন না।

একদিন দেখেন অতিকায় ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে দুটো অফিসারের মাঝখানে ইউনিফর্ম পরা একটা মেয়ে হা হা করে হাসছে। দেখে খারাপ লেগেছিল। এক একসময় ভয় হয় দেশটাকেই বোধহয় ওরা খারাপ করে দিয়ে যাবে।

গুরুদাসের জীবনে তো কোন বৈচিত্র্য নেই। অসংখ্য মানুষ ওঁর চোখের সামনে দিয়ে নিত্যদিন আনাগোনা করে। কে কোথায় চলে যাচ্ছে। একা উনিই শুধু পড়ে আছেন। এত লোকজনের মধ্যেও কখনো কখনো নিজেকে মনে হয় বড় একা।

দুই

ল্যেট করে করে শেষে বেলা বারোটায় রাঁচি এক্সপ্রেস এসে থামলো। এ-সব ট্রেনের এখন আর তেমন কদর নেই। সারা পথ সাইডিংয়ে সরিয়ে দিয়ে মিলিটারি স্পেশাল সাঁ করে বেরিয়ে যায়, মেল এক্সপ্রেসও ধিকিয়ে ধিকিয়ে ল্যেটে এসে পৌছয়।

সকাল থেকেই উদ্বেগ বুকে নিয়ে গুরুদাস টেলিগ্রাফ যন্ত্রটার কাছে ঘুর ঘুর করেছেন।

মাঝে মাঝেই প্রশ্ন করেছেন, কি হে রতনমণি, দেরী কত?

রতনমণি মানে তারবাবু। তিনি টরে টক্কা টরে টক্কা করে বারলাঙ্গাকে প্রশ্ন করেছেন। তারপর হাসতে হাসতে বলেছেন, শুনুন কি জবাব দিচ্ছে।

টকাটক টকাটক উত্তর এসেছে, গুরুদাস শুনেছেন। এ-সব ওঁকেও একসময় করতে হয়েছে। এখনো তারবাবু হঠাৎ অসুখে পড়লে রিলিভিং না এসে পৌছনো অবধি উনিই কাজ চালিয়ে নেন। কিংবা এ এস এম যে থাকে।

ইন্দ্র আর নীপা আসবে। তাই এত উৎকণ্ঠা। দিনকাল ভাল নয়, আর মিলিটারির লোক কোথায় কি ঝামেলা বাধিয়ে বসে। আগে এত দুশ্চিন্তা ছিল না, স্কুলে পড়ার সময়েই নীপা কতবার একা এসেছে। এখন আর গুরুদাস সাহস পান না। তাই ইন্দ্র আর নীপা একসঙ্গেই আসে। ফিরে যায়।

ট্রেন এসে দাঁড়াতেই সব কাজ ভুলে প্লাটফর্মে ছোটাছুটি করলেন গুরুদাস। কোন কামরায় ছেলেমেয়েরা আছে কি না।

গুরুদাস সকালে সাদামাটা পোশাকেও স্টেশনে চলে আসেন। বকশি কিন্তু কাঁধে স্ট্রাইপ খাকি পোশাকটা কখনো ছাড়ে না। ওর মধ্যে যেন বেশ একটা গর্ব বোধ করে।

শেষ অবধি গুরুদাসও অবশ্য বণ্ড-সই করেছেন। প্যারেডের জন্যে ঐ পোশাকে একবার যেতে হয়েছিল। সাহেব ক্যাপ্টেনের ধমক আর উপদেশ শুনে ফিরে এসে ইউনিফর্মটা পরা অভ্যাস করেছেন।

ইন্দ্র আর নীপাকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে গেলেন। প্যাসেঞ্জার এখানে বড় একটা নামে না। কম্পার্টমেণ্ট থেকে দু-একজন মিলিটারির লোক নেমে দাঁড়ায়, ট্রেন ছাড়লেই আবার উঠে পড়ে।

ক্যাপ্টেন বেল কিংবা মেজর হুইটলি যখন স্টেশনে আসেনি, সৈন্যরা কেউ এ ট্রেন থেকে নামবে না।

নীপা আর ইন্দ্রর কাছে পৌঁছনোর আগেই গুরুদাস দেখতে পেলেন পানিপাঁড়ে বিরজু ওর ড্রাম বসানো জলের ঠেলাগাড়িটা ফেলে রেখে দৌড়চ্ছে। একটা হোল্ড অল কাঁধে নিয়ে নীপার হাত থেকে বড় চামড়ার স্যুটকেশটা ছিনিয়ে নিয়েছে। তারপর চেঁচাতে শুরু করেছে, আরে এ ভজনলাল!

এ-স্টেশনে লাইসেন্সড কুলি দু-চারটে ছিল। কিন্তু প্রায়ই তাদের দেখা মেলে না। যুদ্ধের বাজারে অগুনন্তি ঠিকাদার আর সাপ্লায়ার। ক্যাম্পে কেউ ডিম রুটি সাপ্লাই দেয়, কেউ কোলকাতায় চালান দেয় কাঠকয়লা কিংবা বাবলার কাঁটা। তাদের হয়ে খাটাখাটনি করেই লাইসেন্সড কুলিদের দিব্যি চলে যায়। তারা থাকলেও অবশ্য বিরজু আর খালাসী ভজনলালের মতই খুশি মুখে মাল পৌঁছে দিত।

বিরজু আর ভজনলাল ওদের হোল্ড অল স্যুটকেশ নিয়ে কোয়ার্টায়ের দিকে চলে গেল।

আর গুরুদাসকে দেখে নীপা ছুটে এলো ওঁর কাছে।

—ঘুমোতে পেয়েছিলি ?

নীপা আর ইন্দ্র হাসলো। নীপা বলতে যাচ্ছিল, জানো বাবা···

গুরুদাস বললেন, যা গিয়ে স্নান করে রেস্ট নিবি যা। পরে শুনবো।

আসলে বুঝতেই পারছেন, অনেক কথা জমা হয়ে আছে।

সেবার এসে, বোমা পড়ার বর্ণনা যেন ফুরোয় না। 'আমরা ছাদে

উঠে দেখেছি বাবা, সত্যি দেখেছি। কি শব্দ, আর যেখানে পড়লো...' কিংবা 'জাপানী প্লেনের কেমন গুট গুট গুট গুট আওয়াজ। সবাই বলছে পীজবোর্ডের প্লেন।' বলে হেসেছে।

এবারও হয়তো তেমন কিছু।

ওরা চলে যেতেই একটা কথা মনে পড়ে গেল। নিজের মনেই হেসে ফেললেন।

ট্রেনটা তখন ছেড়ে দিয়েছে। ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে গার্ড ওঁর দিকে তাকিয়ে হাসলো, উনি লক্ষ্যও করলেন না। গার্ডের গাড়িটাও ওঁকে পার হয়ে চলে গেল।

—বাবা, তুমিও মিলিটারি? নীপা যেন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

ডি অফ আইয়ে জয়েন করে যেদিন খাকি ইউনিফর্ম নিয়ে এলেন, চারুবালার হাসি আর থামে না। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, শেষে বুড়ো বয়সে কপালে এও ছিল!

আর নীপা নতুন পোশাকের প্যাকেট খুলে দোকানে মাপ দেখার মত করে খাকি বুশ কোটটার দু'কাঁধ দু'হাতে ঝুলিয়ে বলেছিল, বাবা, পরো না, কেমন দেখায় একবার দেখি।

সবাই হেসে লুটোপুটি। ইন্দ্র অতটা সাহস করে না, সে একটু লজ্জা পেল শুধু। হেসে ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

মেয়ের আদুরে বায়নার কাছে গুরুদাস বড় অসহায়। ওঁর নিজেরও যথেষ্ট লজ্জা আর সঙ্কোচ। চিরকাল বাড়িতে লুঙ্গি আর সাদা টুইলের শার্ট পরেছেন। গরমের দিনে মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়েছেন। এখন ইউনিফর্ম পরতে লজ্জা।

মুখে বললেন, খাকি পরলেই কি আর মিলিটারি হয়? আমরা হলাম ভেতো বাঙালী।

নীপা কিন্তু ঐ পোশাকটা না পরিয়ে ছাড়েনি। আর তা দেখে চারুবালা শব্দ করে হেসে উঠেছিলেন।

নীপা ধমক দিয়ে বলেছিল, কেন হাসছো মা, দেখ কেমন চমৎকার দেখাচ্ছে।

ও সত্যি সত্যি মুগ্ধ চোখে বাবাকে দেখেছিল। ঝকঝকে পিতলের বোতাম, কাঁধে ব্যাজ বুকে স্ট্রাইপ, গুরুদাস তখন যেন অন্য মানুষ। কেমন রাশভারি, রাশভারি।

ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীপাও হঠাৎ হেসে উঠে বলেছিল, ছাখো মা, বাবাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে, তাই না ?

নিজের অফিস ঘরটিতে ফিরে এলেন গুরুদাস। তাড়াতাড়ি কাজগুলো সেরে নিয়ে একবার কোয়ার্টারে যেতে হবে। ইন্দ্র আর নীপা এখানে ফিরে এলে স্টেশনে গুরুদাসের আর মন টেকে না। তার ওপর আজ আবার সেই খাকি ইউনিফর্ম নিয়ে রঙ্গরসিকতার কথা মনে পড়ে গেছে।

কোয়ার্টারে যাবার জন্যে গুরুদাসের মন ছটফট করছিল।

হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, বকশি, একবার ঘুরে আসছি।

বকশি হেসে বললে, আপনাকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে গুরুদাসদা।

দেখাবারই কথা।

কাজের ফাঁকে একটু অন্যমনস্ক হলেই বকশি বলে, কি, গুরুদাসদা, একটু কোলকাতা ঘুরে এলেন ?

এখন কোলকাতাই তো ওঁর ঘরে।

স্নান সেরে দুপুরে খেতে বসে নীপা আর ইন্দ্র বাবা-মার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলো। নীপাই বেশি। ও একেবারে অনর্গল। ইন্দ্র একটু কম কথা বলে।

গুরুদাস আবার স্টেশনে চলে যেতেই নীপা বাগানে বেরিয়ে এলো।

কোয়ার্টারের সামনে অনেকখানি জায়গা মেহেদির কাঁটাবেড়া দিয়ে ঘেরা ফুলের বাগান। নীপাই এখান ওখান থেকে এনে বসিয়েছে। বাগানের মালী সেই পানিপাঁড়ে বিরজু। নীপা যখন হস্টেলে ফিরে

যায় বিরজুই দেখাশোনা করে। সকালে মশলা বাটা থেকে বাগানে খুরপি দিয়ে মাটি ঢিলে করা কিংবা ঝাঁঝরিতে করে জল দেওয়া সবই তার কাজ।

নীপা বাগানের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, যাক। বিরজুটা কাজে ফাঁকি দেয়নি।

ঘুরে ঘুরে বেলি ফুলের গাছগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, মা। পরক্ষণেই হেসে ফেললো।

দেখেছো কাণ্ড। মা ঠিক কুমড়োর বীজ বসিয়ে দিয়েছিল, একটা লাউয়ের। দুটোই ইতিমধ্যে লতিয়ে উঠেছে। রান্নাঘর ছাড়া মা আর কিচ্ছু বোঝে না।

নাকি বিরজুই এনে বসিয়েছে? কে জানে!

বিরজু আসলে পানিপাঁড়ে। স্টেশনে জলের গাড়িটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায় ট্রেনের কামরার সামনে দিয়ে, গরমের দিনে চতুর্দিক থেকে চিৎকার ওঠে, এই পানিপাঁড়ে, এই পানিপাঁড়ে। আর বিরজু একে একে তাদের আঁজলায় জল ঢেলে দেয়, কারো লোটাতে, কারো কুঁজোয়। মুখচোখ দেখে মনে হয় যেন পুণ্য সঞ্চয় করছে।

কিন্তু সারাদিনে তো ক'খানা মাত্র ট্রেন। বাকি সময়টা ও মাস্টার-বাবুর অথবা স্টেশনের অন্য কোন বাবুর ফাইফরমাশ খেটে দেয়। নীপাদের বাড়িতেই বেশি। মশলা বাটে, হাটবাজার করে দেয়, বাগানের তদারকি করে।

প্লাটফর্মে কোথাও বিরজু আছে কিনা দেখার জন্যেই নীপা সেদিকে তাকিয়েছিল। দেখতে পেলে জিজ্ঞেস করবে লাউ আর কুমড়ো কে বসিয়েছে। দিব্যি লতানে গাছ দুটো বেল যুঁই দোপাটি আর কলাবতীর ফাঁক থেকে এঁকেবেঁকে বারান্দার কাঠের জাফরি আঁকড়ে ধরেছে। নেহাৎ মাধবী লতাটা জাফরির গায়ে জমজমাট হয়ে আছে তাই চোখে পড়বে না কারো।

ঐ সব বেগুন টমাটো লাউ কুমড়োয় নীপার প্রবল আপত্তি। এ

যেন কলকাতার রাস্তায় সুন্দর সুন্দর বাড়ির ফাঁকে একটা নোংরা বস্তির মত। রুচিতে বাধে। বলেছিল, ও সব করতে হয় খিড়কির দিকে করো।

এতদিন পরে এসেছে, এখন আর মার সঙ্গে ঝগড়া করার ইচ্ছে নেই নীপার। ও শুধু মনে মনে হাসলো।

বিরজুর খোঁজ করতে গিয়ে চোখ চলে গেল পি ও ডবলু ক্যাম্পের দিকে।

একদিন এই বাগানে দাঁড়িয়েই, গতবার যখন এসেছিল, নীপা ওদিকে তাকিয়ে বলেছিল, প্রিজনাররা এখন কি করছে কে জানে।

আর অনুপম, ও তখন কাছেই ছিল, বলে উঠেছিল, দুপুরে ওরা নিশ্চয় মাদুর বিছিয়ে মাসীমার মত ঘুমোয় না।

কথাটা মনে পড়তেই নীপা হেসে ফেললো নিজের মনেই।

না, ইটালিয়ান বন্দীদের এখন আর দেখা যাচ্ছে না। শ্যাওলা সবুজ ক্যানভাস আর কাঠের ঐ খুপরিগুলোর ভিতরেই হয়তো ঢুকে বসে আছে। এখন শুধু রাইফেল কাঁধে টমিরা টহল দিচ্ছে।

বিকেলের দিকে প্রিজনারদের একবার দেখা যায়। আগের বার এসে তো ওদের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই সময় কেটে যেত। নিরস্ত্র মানুষগুলো ওদের ইটালিয়ান ইউনিফর্ম পরেই সারি দিয়ে দাঁড়ায়, আর ব্রিটিশ অফিসাররা বোধহয় নাম ডাকে। রোল কল করে। এক একজন এগিয়ে আসে, আবার পিছিয়ে গিয়ে লাইনে দাঁড়ায়। তারপর সন্ধ্যেবেলা দেখা যায় ডোরা কাটা স্লিপিং স্যুট পরে লাইন দিয়ে কলাই করা মগে কফি নিচ্ছে। সকালেও এই একই দৃশ্য।

ওদের সম্পর্কে নীপার দারুণ কৌতূহল।

নীপা ধীরে ধীরে বাড়ির ভেতর ঢুকলো।

সামনে বাগান, বারান্দায় কাঠের জাফরি, আর তিনখানা ঘর। তারপর আবার একটা লম্বা বারান্দা পিছন দিকে, সেটা এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের জাল দিয়ে ঘেরা। একটা দরজাও। সেটা পার হয়ে চওড়া

উঠোন। ছাদ নেই ওখানটায়। তাই উঠোনে কড়া রোদ্দুর। এক-পাশে রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর। অন্যদিকে স্নানের ঘর। আগে বিরজু কুয়ো থেকে জল এনে চৌবাচ্চা ভরে দিত। এখন উঠোনের পাঁচিলের গায়ে একটা কল বসিয়ে দিয়েছে, ঠিক খিড়কির দরজার পাশেই। স্নানের ঘরেও। কলটা সব সময়েই খোলা থাকে, ছরছর করে জল পড়ে। বন্ধ করার কথা কারো মনে থাকে না।

নীপা এসে কলটা বন্ধ করে দিল।

একবার রেলের পি ডবলু ডির এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওভারসিয়ার ছাদ সারানো দেখতে এসে এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে কলটা বন্ধ করেছিল যে নীপা ভীষণ লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে কল খোলা থাকলেই নীপা গিয়ে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু অপচয় যে একটা অন্যায় আজও মাকে বোঝানো গেল না। কাউকেই বোঝানো যায় না। অপচয় বোধহয় আমাদের স্বভাব।

নীপা কলটা বন্ধ করে রান্নাঘরের পাশের একটুখানি ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখলো মা এই চড়চড়ে রোদ্দুরে উঠোনে বসে কাচের জার বোতল বয়াম সাজিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের থালায় কুলের আচার আমসত্ত্ব বড়ি রোদ্দুরে দিচ্ছে। ওসব মার সারা বছরের রসদ।

একটা থালায় আমের আচার দেখে নীপার মুখ হেসে উঠলো। ও ছুটে গিয়ে একটা আচার তুলে নিয়ে জিভে ঠেকালো। জিভে একটা শব্দ করে বললে, দারুণ। তৃপ্তিতে সত্যি সত্যি চোখ বুঁজে এলো ওর।

চারুবালা তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে। হাসলেন। ওদের জন্যেই তো এসব করা, ওরা খেলেই সুখ।

—যাবার সময় দিয়ে দেব সঙ্গে। একটু থেমে বললেন, সেবার দিয়েছিলাম, খেয়েছিলি তো?

নীপা হেসে বললে, সে তো দুদিনেই শেষ। চারুবালাকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বললে, এবার একটু বেশি করে দিও, কেমন?

চারুবালার মুখ খুশিতে ভরে উঠলো, আর তা দেখে নীপা দুম করে

বলে বসলো, একটু ঘুরে আসবো মা ?

চারুবালা অবাক হলেন। —এই রোদ্দুরে কোথায় যাবি ? ইন্দ্র ঘুমোচ্ছে, ও উঠুক।

নীপা হেসে উঠলো। —মা, তুমি কি হচ্ছো বলো তো ! শনিচারীর হাটের দিকে যাবো, তাও দাদাকে বডিগার্ড নিতে হবে ?

চারুবালা বললেন, তা বলছি না।

এই শনিচারীর হাট থেকে তো নীপা কতদিন থলি হাতে বাজার করে এনেছে। মিলিটারির ভয়ও নেই। বড় একটা নোটিশবোর্ড টাঙানো আছে—আউট অফ বাউণ্ডস। একটা কি ঝামেলা হওয়ার পর এদিকে সৈন্যদের আসাই নিষিদ্ধ হয়ে আছে।

আর এই ছোট্ট জায়গায় সকলেই তো পরিচিত। মাস্টারবাবুকে সবাই এখানে সম্ভ্রম করে কথা বলে, মাস্টারবাবুর মেয়েকেও সমীহ করে।

নীপা এসে মার সামনে মুখ কাচুমাচু করে দাঁড়ালো। —মা, প্লীজ, একটু ঘুরে আসি, কতদিন পরে এলাম বলো।

চারুবালা ওর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেললেন। —কলকাতায় তো কত ঘুরতে পাস, তবু শখ মিটলো না।

নীপা ততক্ষণে হাসতে হাসতে খিড়কির দরজা পার হয়ে গেছে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা উঠোনের ওপারে।

এসব দিকের সব কোয়ার্টার্সেই খোলা উঠোন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

নীপা যখন খুব ছোট ছিল, তখন বোধহয় চক্রধরপুরে, মা দুপুরে বেরোতে দিত না। নীপা একটা টুল এনে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাতো। সে-কথা মনে পড়তেই নীপা হেসে ফেললো।

তারপর একেবারে সটান উমাদের বাড়ি। এল বি এস ঘোষাল-বাবুর মেয়ে উমা ওর খুব বন্ধু। কুলিখালাসীরা বলে ব্লকবাবু। উনি লাল শালুর পতাকা উড়িয়ে ঠেলা ট্রলিতে এখানে ওখানে যান। মাঝপথে ট্রলি থামিয়ে পোস্ট দেখেন, কোথাও রেল-টেলিফোনের কলকব্জা বিগড়ে থাকলে মেরামত করেন। মাঝে মাঝে রাত্তিরেও

বেরিয়ে যেতে হয়। জনা আষ্টেক ট্রলিম্যান আছে, তারা ফাইফরমাশ খাটে। আবার রেললাইনের ওপর ট্রলি চাপিয়ে ট্রলি ঠেলে নিয়ে যায়। একটা বড় ছাতার নীচে ঘোষালবাবু বসে থাকেন।

একদিন উমা আর নীপা ঘোষালবাবুর সঙ্গে ট্রলিতে চড়ে অনেক দূর গিয়েছিল। বেশ মজা!

আসলে এখানে এলেই নীপার চরিত্রটা বদলে যায়। কোলকাতায় তো শুধু বাধানিষেধ। হস্টেলের মেয়েরা সব দলবেঁধে বেরোয়, সিনেমা দেখে। একা বেরোলেই নানান ফিসফাস। আর পুরুষ দেখলেই লজ্জায় কুঁকড়ে থাকে, কথা বলে না!

প্রথম প্রথম দেখে নীপার খুব হাসি পেত। এখন ও নিজেও ওদের মত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এলেই অন্য রকম।

উমার মা ওকে দেখে বললেন, একটু মোটা হয়েছিস রে।

উমা বললে, ভেবো না মা, আবার রোগা হয়ে যাবে। এই তো শুরু হল টো টো করে ঘুরে বেড়ানো।

সবাই হেসে উঠলো, নীপাও।

তারপর একসময় দু বন্ধুই বেরিয়ে পড়লো।

খিড়কির দিকটায় কয়েক গজ সমতল, তারপরই ঢালু হয়ে নেমে গেছে। প্রায় পাহাড় থেকে নামার মত করে ছুটতে ছুটতে ব্রেক কষে কষে নামতে হয়। ওটা ইন্দ্রর কথা। এদিকে সব উঁচু নীচু, কোথাও চড়াই, কোথাও উৎরাই। ইন্দ্র তাই বলেছিল, গড়িয়ে পড়িস না যেন, ব্রেক করে করে চল।

স্টেশন এলাকাটা অনেক উঁচুতে। ঢল নেমে এসে নীচে একটা জল-কাদার নালা, বর্ষায় দু'পার ছাপিয়ে ওঠে। সেটা লাফিয়ে পার হলেই পীচ রাস্তা। নানাদিকের বাস চলে, রাঁচি থেকে পালামৌয়ের দিকেও যায় একটা। কখনো বা সারি সারি অতিকায় মিলিটারি ট্রাক চলে; আমেরিকান ট্রাকে দৈত্যের মত নিগ্রো ড্রাইভার।

ঐ পীচের রাস্তাটা পার হয়ে গেলেই ধু ধু ভাঙাচোরা মাঠ, মাঠের

শেষে শনিচারীর হাটের চারপাশে বসতি। কয়েকঘর বাঙালীর বাড়ি আছে ওখানে। চার পাঁচটি হিন্দুস্থানীদের। আর তার পাশেই ঠিকাদার-পাড়া। আগে একজনই ছিল, কাছাকাছি দু-তিনটে কোলিয়ারির কণ্ট্রাক্টর। এখন ঠিকাদার আর সাপ্লায়ার বেড়েছে মিলিটারির কল্যাণে, জায়গাটা প্রায় গঞ্জ মত হয়ে উঠছে।

অনুপম ফিরেছে কিনা নীপা জানে না। উমা দেখেছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করতে পারেনি। জিজ্ঞেস করলেই তো কিছু একটা ইয়ার্কি ছুঁড়ে দেবে।

ডাক্তার হাজরার ছেলে অনুপম। রুরকিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। তার হস্টেলের ঠিকানাও জানে, রুম নম্বর অবধি।

—কি মশাই, কবে চললেন? আমার তো দিন ফুরিয়ে এলো। যাবার আগে একদিন ঠাট্টার সুরে নীপা জিজ্ঞেস করেছিল অনুপমকে। অনুপমের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা এমন জায়গায় এসে থেমে থিতিয়ে আছে যে অনেক কথাই স্পষ্ট করে বলতে সঙ্কোচ হয়, জানতে বাধো বাধো ঠেকে। তাই আপনি আজ্ঞে করে কৌতূহল চাপা দিতে হয়।

অনুপমও সমান চাপা স্বভাবের। ওর কথার উত্তরে অনুপম হাল্কা ভাবে বলেছিল, আর এক সপ্তাহ। সতেরো তারিখ থেকে আমার অ্যাড্রেস আর শনিচারী রোড, রামগড় নয়।

তারপর হেসে উঠে বলেছে, এরপর আমার ঠিকানা···

হস্টেলের নাম, রুম নম্বর, রাস্তার নাম সব গড়গড় করে বলে গেছে। যেন নীপা খাতা কলম নিয়ে লিখে নিচ্ছে।

উমার সামনেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। তা নিয়ে উমার সঙ্গে পরে কত হাসাহাসি। নীপা নিজেও হেসেছে।

উমা বুঝিয়েছে, নির্ঘাৎ তোকে চিঠি দিতে বলছে।

নীপা চোখ বড়ো বড়ো করে বলেছে, সত্যি? তারপরই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। —যাঃ তা কখনো হয়।

নীপার একবার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে, একবার ভেবেছে

অনুপম তো ঐ রকমই। কখন যে কি বলে...

প্রথমবার গুরুদাস যখন এখানে রিলিভিং করতে এসেছিলেন, বাঙালী বলেই তখন আলাপ হয়ে গিয়েছিল ডাক্তার হাজরার সঙ্গে। নীপা তখন ফ্রক পরে, বেশ ছোট। অনুপমও স্কুলে। ইন্দ্র অনুপম নীপা খুব বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। তুই-তুই।

বছর কয়েক পরে গুরুদাস আবার এলেন। এ এস এম হয়ে।

ইন্দ্র একদিন গেল। গুরুদাস আর চারুবালাও দেখা করতে গেলেন ডাক্তার হাজরার বাড়িতে। ডাক্তার মানুষ, আলাপ রাখা ভাল। রেলের ডাক্তার, রেলের হাসপাতাল মানেই তো ঝামেলা। নীপা কিন্তু এড়িয়ে গেল।

গুরুদাস বললেন, সে কি। যাবি না কেন? অনুপমকে মনে নেই?

মনে ছিল নীপার, সেজন্যেই হয়তো সঙ্কোচ। নীপা তখন শাড়ি পরছে, বড় হয়েছে। সেজন্যেই কেমন একটা জড়তা আর লজ্জা।

চারুবালা বললেন, কত ক্যারম খেলেছিস, লুডো খেলেছিস...

শেষে অনুপমই একদিন এলো। বাড়িসুদ্ধ সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। ডাক্তারের ছেলে বলেও একটু বিশেষ আদর।

নীপার তখন কতই বা বয়স? ক্লাশ নাইনে পড়ে, বোর্ডিংয়ে থেকে। কিন্তু শাড়ি ওকে যেন অন্য মানুষ করে দিয়েছে।

নীপা শুনেই বুঝেছে। সেজন্যেই হয়তো আরো গুটিয়ে গেল।

আর মা চিৎকার করে হেসে হেসে ডাকলো।—নীপা, কোথায় গেলি, দেখে যা কে এসেছে।

ও সাড়া দিতে পারলো না। তবু যেতেই হল। না গেলে খারাপ দেখায়।

চোখ তুলে অনুপমের দিকে তাকিয়েই মাথা নীচু করে ফেললো নীপা। একটা জড়তা পেয়ে বসলো ওকে।

অনুপমকে দেখলো এক পলকের জন্যে। মাথায় লম্বা হয়েছে, গোঁফের সবুজ সবুজ রেখা নাকের নীচে। গলার স্বরটাও কেমন বদলে গেছে।

নীপার মনে হল অনুপমও' লজ্জা পাচ্ছে। কোনরকমে বললে, ভাল আছো ?

নীপাকেও বলতে হল, আপনি ভাল আছেন ?

ইন্দ্র আর মা হেসে উঠলো শব্দ করে। —আপনি কি রে ? চিনতে পারছিস না ?

চিনতে ঠিকই পেরেছিল, কিন্তু আগের মত সহজ হয়ে উঠতে, তুই বা তুমি বলতে সঙ্কোচ।

নীপা পালিয়ে এসে বেঁচেছিল।

বছর কয়েক পরে আবার এলেন গুরুদাস, স্টেশন মাস্টার হয়ে স্থায়ীভাবে এসে বসলেন। তখন আর নীপার কোন জড়তা নেই। তখন নীপাও কলেজে।

সেই পুরোনো দিনের কথা মনে করে অনুপম ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলেছিল, আপনি ভাল আছেন ?

সবাই হেসে উঠেছিল, নীপাও।

তারপর থেকে আবার সহজ স্বাভাবিক। সহজ স্বাভাবিক বলেই বুকের ভিতরে একটা তার কখনো কখনো টুং টুং করে বাজলেও সেটা ঠাট্টা আর হাসি দিয়ে চেপে রাখতে হয়।

অনুপমও হয়তো সেজন্যেই স্পষ্ট করে বলতে পারেনি, চিঠি লিখো। যেন উচ্চারণ করলেই নিজের কানেই হাস্যকর ঠেকবে।

কিন্তু এখন ডাক্তার হাজরার বাড়ি গিয়ে যদি শোনে অনুপম এখনো ফেরেনি রুরকি থেকে, তা হলে নীপার ভীষণ খারাপ লাগবে। একা মনে হবে।

একবার ইচ্ছে হয়েছিল একটা সাদামাটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিতে। তারপর একটাই প্রশ্ন, তোমার হস্টেল কবে বন্ধ হচ্ছে, কবে ফিরছো ?

—কিরে কি ভাবছিস এত ?

উমার কথায় তন্ময়তা ভাঙলো। নীপা হাসলো শুধু।

ঢালু বেয়ে নেমে এসে একটা সরু নালা। গাড়ি পার করার জন্যে

দূরে একটা কালভার্ট আছে। তার ওপর দিয়ে ডাক্তার হাজরার টাঙাটা মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায় কোয়ার্টারের সামনে। কখনো সখনো কোলিয়ারির ট্যাক্সি কিংবা জীপও আসে।

অত ঘুরে যেতে রাজি নয় ও। লাফ দিয়েই নালাটা পার হল, ওর হাত ধরে উমাও। পীচ রাস্তাটা পার হয়ে তিন-চারখানা টালির ছাদের দোকানঘর। একটায় দেহাতিদের জন্যে চিঁড়ে আর ফুলুরি ভাজার দোকান। লোকটা এখন আছে, সন্ধ্যের আগেই গাঁয়ে ফিরে যায়। একটা পড়েই আছে, দরজা খোলেই না। দোকানদারটা মারা গেছে কিনা কে জানে। তার পাশেই আরেকটা, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওটা ডাক্তার হাজরার ওষুধের দোকান। সকালে কম্পাউণ্ডার আসে। উনিও ঘণ্টাখানেক বসেন। এখন বন্ধ।

ঘরটায় একবার উঁকি দিয়েই শনিচারীর হাটের পথ ধরলো দুজনে। শব্দ শুনে আকাশের দিকে তাকালো। তিনটে প্লেন পাশাপাশি উড়ে চলেছে। ফাইটার প্লেন হয়তো। মেঘ কেটে কেটে চলেছে।

শনিচারীর হাট আজ নির্জন। কয়েকটা হোগলা পাতার ভাঙা ছেঁড়া ছাউনী পড়ে আছে। ঠিকাদারদের কুলিকামিনরা, কাছাকাছি দু-একটা মুণ্ডাধাওড়ার লোক শনিবারে মাইনে পায় বলে হাট জমে ওঠে। তরিতরকারি থেকে খাটো শাড়ি, ছোট্ট আয়না, পুঁতির মালা, লাল সবুজ সুতলি, কাচের চুড়ি—কি নেই।

বাজপেয়ীজীর বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে নীপার একটু মজা করতে ইচ্ছে হল।

গলা ছেড়ে চেঁচালো, চাচীজী, চাচীজী।

জোরে জোরে দরজার কড়া নাড়লো।

দরজা খুলতেই বাজপেয়ীর স্ত্রীর নথ পরা গোলগাল মুখে হাসি দেখা দিল—আরে বেটিয়া, তু কব এলি ?

বাজপেয়ীজীও তখন বেরিয়ে এসেছেন। হাসছেন। —আওয়াজ শুনলেই মালুম হয় কি মাস্টারজীর লেড়কি।

নীপাও খিলখিল করে হাসলো। —হালুয়া বানাও চাচী, খেয়ে যাবো।

বলে উঠোনের ছায়ায় পাতা খাটিয়ায় বসে পড়লো।

চাচী হাসতে হাসতে উমাকে বললে, তু ভি বৈঠরে উমা, হালুয়া জরুর বানাবে।

হালুয়া মানে সুজির পায়েসের মত, কিন্তু সুজির নয়, স্রেফ ভাজা আটা আর গুড়ের। খেতে একটুও ভাল নয়।

দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে বসে গড়াগড়ি দিয়ে চাচীর সঙ্গে গল্প করে নীপা একসময় উঠে দাঁড়ালো। —ফিরতি পথে খেয়ে যাবো চাচী, বানিয়ে রাখো।

চাচী হাসলো ঘাড় নেড়ে। বাজপেয়ী বললে, জরুর আসবে।

ওরা বেশ জানে গল্প করতে করতে নীপা কোথায় চলে যাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। হয়তো এক হপ্তা বাদে এসে হাজির হবে।

এখন তো সব বাড়িতেই গুড়ের চা, চিনি পাওয়া যায় না। স্টেশনের চায়েও গুড়ের গন্ধ। শুধু রেল-কোয়ার্টারের লোকরা অঢেল র‍্যাশন পায়। প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। তাই মাঝে মাঝে গুরুদাস বাড়তি চিনি ডাক্তার হাজরাকে দিয়ে দেন। সেজন্যেই কিনা কে জানে, ওঁর বাড়িতে গেলেই চা পাওয়া যায়।

উমা হঠাৎ বললে, আজেবাজে ঘুরে কি হবে, চল ডাক্তারবাবুর বাড়িতে চিনির চা খাওয়া যাবে।

নীপা তাকালো উমার দিকে। না, ঠাট্টা নয়।

ডাক্তার হাজরার বাড়িটা বেশ বড়ো, তার দিয়ে ঘেরা অনেকখানি বাগান। বাগানে লোহার গেট। কিন্তু বাগানে গাছপালা কিছুই নেই। দেখে মনে হয় একসময় ছিল, অযত্নে সব নষ্ট হয়ে গেছে।

নীপার খুব গাছের শখ। তাই এতখানি জায়গা পড়ে আছে দেখে ওর খুব ইচ্ছে হয় একটা বাগান করে তোলার।

—আরে মিস তুফান মেল যে, এসো এসো নীপা, কবে এলে ?

নীপাকে দেখতে পেয়েই উনি ডাকলেন। দেখে মনে হল কল-এ বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। টাঙাটা দাঁড়িয়ে আছে।

নীপা হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এলো।

অনুপমের মা কালো আর মোটাসোটা। একটু রাগী রাগী চেহারা। কিন্তু মোটেই রাগী নন। পানের সঙ্গে জর্দা খান, কাছে গেলে একটা ভুরভুরে সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়।

ওঁর কথা বলার ধরনটাই বাঁকা বাঁকা। মুখে একটু জর্দা ফেলে বললেন, ওদিকে রুগী মরছে, এই শুরু হল গল্প।

ডাক্তার হাজরা হাসলেন। —রুগীর কি শেষ আছে, বলো নীপা? একটা মরবে আবার একটা রুগী হবে। তা বলে গল্প করবো না?

গলার স্টেথিসকোপ কোটের পকেটে পুরলেন।

আর উমা বলে বসলো, মাসীমা, চা খাবো কিন্তু।

ব্যস, ডাক্তার হাজরাও বারান্দার চেয়ারে বসে পড়লেন।

গল্প পেলে উনি আর কিছু চান না। রুগীর বাড়িতে গিয়েও রোগ কি তা জিজ্ঞেস করতে ভুলে যান, প্রেসক্রিপশন লিখতে। তার বদলে কেবল সাংসারিক কথাবার্তা, ছেলেকে ভাল ইস্কুলে দিচ্ছেন তো, মেয়ে তো বড় হল বিয়ে দিয়ে দিন, কি রে রাজুয়া, ক্লাশে লাস্টের দিক থেকে কত স্ট্যাণ্ড করলি?

ডাক্তার হাজরাকে সকলেই চেনে এ তল্লাটে। পুরু ভুরু, ভুরুর লোম অর্ধেক পাকা, হাতে ডাক্তারি ব্যাগ, ঢিলেঢালা কোটের পকেট দুটো ফুলে ফেঁপে আছে, স্টেথিসকোপ উঁকি দেয় পকেট থেকে। কিন্তু আসল চেহারাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় টাঙাটা না দেখলে।

ওঁর নিজস্ব একটা টাঙা আছে। ঘোড়াটাও তেমন হাড় জিরজিরে নয়। টাঙা চালাবার জন্যে একটা লোকও আছে—মাধোলাল। ডাক্তার-বাবুর বাড়ির পিছন দিকে থাকে। কিন্তু দরকারের সময় তাকে পাওয়া যায় না, কিংবা শোনেন মদ খেয়ে শিউজীর মন্দিরের চাতালে বসে আছে। তাই রাতে-বিরেতে রুগী দেখতে হলে নিজেই টাঙাটা চালিয়ে নিয়ে যান।

ডাক্তার হাজরা চায়ের নাম শুনে বসে পড়লেন। —তবে একটু চা খেয়েই যাই। মিস তুফান মেল যখন এসেই পড়েছে······

এই নামকরণেরও একটা ইতিহাস আছে। এখানে একটা সিনেমা হল্ আছে, মাঝে মাঝে বাজে ছবি আসে। একবার একটা হিন্দি ছবি দেখতে গিয়েছিলেন সকলে মিলে। ডাক্তার হাজরার বাড়ির সকলে, নীপারা সবাই, আরো কে কে। ছবিটার নাম মিস তুফান মেল। নীপার মতই সুন্দর দেখতে একটা মেয়ে, জলে ঝাঁপিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে, পিস্তল ছুঁড়ে চলন্ত মেল ট্রেনের ছাদ থেকে চলন্ত লরিতে লাফিয়ে পড়ে, নিজে লরি চালিয়ে শেষ অবধি এক দুরন্ত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়ে পুলিস ইন্সপেক্টরকে বিয়ে করলো। তারই নাম মিস তুফান মেল। ছবি দেখতে দেখতে গুরুদাসও অট্টহাসে হেসেছেন। আর বেরিয়ে এসে ডাক্তার হাজরা নীপার নাম দিয়েছেন মিস তুফান মেল। ওর ডানপিটে স্বভাবের জন্যে। আর এই স্বভাবটাকে ডাক্তার হাজরার খুব ভাল লাগে।

চা খেয়ে উঠলেন ডাক্তার হাজরা। বললেন, চলো তা হলে টাঙায়, নামিয়ে দিয়ে যাবো।

আর নীপা আব্দারের গলায় বলে বসলো, আমি চালাবো কিন্তু, ডাক্তারকাকু।

ডাক্তার হাজরা হা হা করে হেসে বললেন, বেশ বেশ।

মাধোলাল বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, ডাক্তার হাজরা বললেন, যাও দারু পিও।

উঠে বসলেন টাঙায়। টাঙাওয়ালার জায়গায় নীপা বসলো। পাশে উনি। তারপর উমা। লাগামটা নীপাকে দিয়ে দিলেন, কিন্তু দরকার পড়লেই নিজের হাতে নিয়ে নেবেন। এভাবে নিজে চালিয়েই কতদিন রাত্রেও রুগী দেখতে গেছেন।

টাঙায় উঠে ডাক্তার হাজরা স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন। —তুমিও চলে এসো না, লেট আস হ্যাভ এ জয়-রাইড। বলে হেসে উঠলেন।

টাঙাটা তখন চলতে শুরু করেছে, নীপা আর উমা দু'জনেই হাসছে।

তিন

গুরুদাসের ঘর আর অফিস বলতে গেলে একই। কথায় কথায় বলেন, আমি তো রেলকোম্পানির চব্বিশ ঘণ্টার চাকর। এদিকের এই রেলওয়ে এখনো গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নেয় নি। সাহেব কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স লণ্ডনে বসে ব্যবসা চালায়। তাই একেবারে ওপর দিকের সব অফিসারই খাস ইংরেজ। তার ফাঁকে দু'চারজন ভারতীয় উঁকি দেয়।

চব্বিশ ঘণ্টার চাকর অবশ্য গুরুদাসই নন। এই স্টেশনের প্রায় সকলেই। তারবাবু রতনমণি তাদের সকলের কাছেই একটা আতঙ্ক। 'তার' মানে টেলিগ্রাফ যন্ত্রে আসা মর্সের কোডে জানানো খবর। রতনমণি সেটা লিখে তাঁর পিওনকে দিয়ে কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেন। আর পিওনটাকে কোয়ার্টারের জানালা থেকে দেখতে পেলেই সকলে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করে।

রাত নিশুতিতেও ঘুমিয়ে নিশ্চিন্তি নেই। গলার স্বরে কোন উত্থানপতন না এনে বেশ জলদগম্ভীর গলায় পিওনটা বাগানের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ে, তার আয়া বাবুজী, তার লিজিয়ে। ব্যস্, ঘুমের মধ্যেও ধড়মড় করে উঠে এসে কাগজটা নিতে হবে, হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কারো ডাক পড়ে অন্য স্টেশনে রিলিভিং-এর জন্যে, কাউকে ট্রলি নিয়ে বেরোতে হয়।

গুরুদাস নিমের কাঠি দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে দেখলেন লাইনের ওপর ট্রলি নামানো হচ্ছে। এই সকাল বেলাতেই। না, পি ডবলু ডির নয়। ট্রলিম্যানদের দেখে চিনতে পারলেন। এল বি এস ঘোষালবাবুর ট্রলি। মাঝপথে কোথাও টেলিগ্রাফ-টেলিফোনে গলদ দেখা দিলেই ওঁকে ছুটতে হয়। লাইন-ক্লীয়ার জেনে নিয়ে চলে যান।

কখনো কখনো রাত্রেই। ভুল খবরের জন্যে অ্যাকসিডেণ্ট হয় শাণ্টিং করতে করতে কোন ইঞ্জিন এসে পড়লে।

গুরুদাস এসে দাঁড়ালেন বাগানের ফটকের কাছে। কোন খালাসী দেখতে পেলে বলতে হবে, কয়লা পাঠিয়ে দিতে। সকাল বেলাতেই চারুবালা মনে পড়িয়ে দিয়েছেন।

এল বি এস ঘোষালবাবুকে যেতে দেখেই গুরুদাস প্রশ্ন করলেন, কি ঘোষাল, কোথায় ডাক পড়লো ?

ঘোষাল হাসলো। খাকি ইউনিফর্মের বুশ-কোটের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে পকেট দুটো নাচাতে নাচাতে বললে, আর বলবেন না, টি ডি আর থেকে খবর পাঠিয়েছে, এই সেদিন পুরো ব্লকটা চেক করে এলাম, আজ আবার।

ঘোষালের ঐ এক মুদ্রাদোষ। বুশ-কোটের পকেট দুটো অন্য ধরনের, যেন পকেটের মাপের দুটো থলি বাইরে থেকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘোষাল পকেটে হাত ঢুকিয়ে ও দুটোকে সদাসর্বদা পাখির ডানার মত ওপর নীচে নাড়ে। আর মিলিটারি অফিসার দেখলেই ভয়ে হাত বের করে নেয়। একবার খুব ধমক খেয়েছিল।

ঘোষাল চলে গেল, ঘোষালের ট্রলিও সাদা ছাতা আর লাল শালুর পতাকা উড়িয়ে রেললাইন ধরে গড়গড়িয়ে অদৃশ্য হল।

গুরুদাস রামভজনকে দেখতে পেয়ে বললেন, কোইলা নেই রামভজন, ইদ্রিসকে বলে দিস।

এখানে কাউকে কয়লা কিনতে হয় না। ইঞ্জিন কিংবা মালগাড়ি থেকে ঝুপ ঝুপ কিছু কয়লা ফেলে দিয়ে যায় খবর দিলেই। খালাসীরা সেগুলো এনে বাবুদের কোয়ার্টারের পিছনে স্তূপীকৃত করে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাঁচা কয়লা, তাই প্রচুর ধোঁয়া ওঠে, এক-পোড়া হয়ে তবেই কোক হয়, রান্নায় লাগে। ওদিকের পোর্টারখুলির কুলিখালাসীরা শীতকালে কয়লার আগুন ঘিরে হাত-পা সেঁকে। সকলেরই এই দস্তুর। রেল কোম্পানিও জেনেশুনে চোখ বুজে থাকে। খালাসীরা হাসতে

হাসতে বলে, কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল।

দাঁত মেজে দাড়ি কামিয়ে সকালে একবার স্টেশনে যান গুরুদাস। কোন কোনদিন চা রুটি পাঠিয়ে দেয় চারুবালা।

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে গত সন্ধ্যার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠলো।

গতকাল সন্ধ্যের ট্রেনে একদঙ্গল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে কত সব বাহারী পোশাক পরে নির্লজ্জ শরীর দেখিয়ে এসে নামলো। কেউ বললে, মিলিটারি মেডিক্যালসের নার্স ওরা। কেউ বললে, ম্যাকক্ল্যাসি-গঞ্জের অ্যাংলো কলোনীর মেয়ে ওরা। পার্টিতে হই হই করবে, মদ খেয়ে ডান্স হবে।

বড় বড় ট্রাকে করে তাদের নিয়ে গেল। যাবার সময় মেয়েগুলোর কি হাসি উল্লাস।

সব দেখেশুনে ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠেছিলেন গুরুদাস। অথচ উপায় নেই, মাঝে মাঝেই এসব বেলেল্লাপনা চোখ মেলে দেখতে হয়।

নীপার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

—মা ছাখো ছাখো, বাবাকে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে।

প্রথম যেদিন বুশ কোট, খাকি প্যাণ্ট পরলেন, কাঁধের স্ট্র্যাপে সাদা স্ট্রাইপ আর ভি, নীপা বলে উঠেছিল।

পোশাক বদলে গেলেই কি মানুষটাও বদলে যায়। নাকি এক একজন মানুষ দল বাঁধলেই অন্যরকম। এই ব্রিটিশ বা আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে ওঁর ক্ষোভের শেষ নেই। বর্বর, সব বর্বর।

অথচ ক্যাপ্টেন বেল অথবা মেজর হুইটলিকে ওঁর ভালই লাগে। দু-একটা টমিকেও। একা থাকলেই ওরা বেশ ভদ্র, মিশুকে। একজন আমেরিকান অফিসারের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল মুরীতে থাকার সময়ে। ব্যারেল ব্যারেল সিগারেট উপহার দিয়ে যেত। গুরুদাস তো সিগারেট খান না, সকলকে বিলিয়ে দিতেন।

এরাই আবার যখন ট্রাকে বসে হই হই করতে করতে যায়, ট্রেনে

হামলা করে, কিংবা মার্চ করতে করতে যায়, তখন আবার অন্য মানুষ।

মানুষের বোধ হয় দুটো চরিত্র। একা একরকম—সে শুধুই মানুষ। সে বাবা কিংবা ছেলে কিংবা ভাই কিংবা শিক্ষিত সজ্জন। একসঙ্গে হলেই আলাদা। খারাপ, খারাপ। সঙ্কীর্ণ মনের মানুষ। নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ। কিন্তু তাই বা কেন? একসঙ্গে হলে সে আবার মহৎও হয়ে যায়। একা মানুষের চেয়েও মহৎ। আদর্শের জন্যে প্রাণ দেয়। ইণ্ডিয়ানরা দিয়েছে, স্বাধীনতার জন্যে। ওরাও, ঐ সৈন্যরাও তো কি সব আদর্শের কথা বলে।

গুরুদাসের হঠাৎ চোখ পড়লো রেললাইনের ওপারে। একটা জীপ এসে থামলো। মেজর হুইটলি নামলো তা থেকে। তামাটে সোনালী গোঁফ, চোখের তারা দুটো কটা, মাথার ফেল্ট হ্যাটে ঝকঝকে পিতলের ক্ষুদে রাজমুকুট, দু-কাঁধেও দুটো ক্রাউন আর হাতে চামড়ায় বাঁধানো হাতখানেক লম্বা বেতের ব্যাটন। হুইটলিকে এমনিতে বেশ রাশভারি মনে হয়, কিন্তু হাসলে গোঁফটাও হাসে।

এই এক ঝামেলা ডি অফ আইয়ে সই করে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে হবে, স্যালুট করতে হবে। অবশ্য হুইটলিও উইশ করবে টুপিতে হাত ছুঁইয়ে, কোন কোনদিন পুরো স্যালুটই ফিরিয়ে দেবে মুচকি হেসে। ঠাট্টা কিনা বোঝাও যায় না।

বকশি একবার সাহস করে হুইটলিকে একটা প্রশ্ন করেছিল।

পি ও ডবলু ক্যাম্পটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, মেজর, স্যার হাউ মেনি প্রিজনার্স আর দেয়ার? ইন ছাট ক্যাম্প?

বকশির ইংরেজি। স্যার বলার অভ্যাস।

হুইটলি সেজন্যেই হয়তো হেসে ফেলেছিল। তারপর গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিল, ছাটস নান অফ ইওর বীজনেস। অথবা ঐ ধরনের কিছু।

গুরুদাস তো প্রথম প্রথম ওদের উচ্চারণ কিছুই বুঝতে পারতেন না। রেলের খাস ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে দিব্যি কথা বলতে পারেন,

বোঝেনও তাদের কথা। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কত গার্ড তো রীতিমত বন্ধু, জমিয়ে আড্ডা দিয়েছেন। অথচ এদের বেলাতেই অসুবিধে হয়। সেজন্যে একটু অস্বস্তিও বোধ করেন।

গুরুদাস এই মাত্র খবর পেয়েছেন একটা মিলিটারি স্পেশাল ট্রেন আসছে।

তাই এগিয়ে গিয়ে হুইটলিকে বললেন, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ, মেজর। এই একটা বাঁধা বুলি শিখে রেখেছেন।

নাট মাচ বা ঐ রকম কি একটা যেন শুনলেন।

মেজর হুইটলি তখন সঙ্গের টমি দুটোকে কি সব নির্দেশ দিচ্ছে।

তাদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে গুরুদাসকে বললেন, আমি প্লাটফর্মটা ব্যবহার করবো, আপত্তি নেই নিশ্চয়ই?

এটা কথার কথা। ওরা তো অর্ডার দেবার সময়েও প্লীজ বলে। গুরুদাস জানেন আপত্তি করা চলে না। কিন্তু কি ভাবে ইউজ করবে তা কিছুই বুঝলেন না। জিজ্ঞেস করলেই বলে বসবে, ইণ্ডিয়ান কিউরিওসিটি। যেন কৌতূহল শুধু আমাদেরই।

মেজর হুইটলি চলে যাবার পরই দুটো মিলিটারি ট্রাক এলো। টমিরা তা থেকে পটাপট গোটা পঞ্চাশ ফোল্ডিং চেয়ার নামিয়ে প্লাটফর্মের মাঝখানে সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখলো।

গুরুদাস ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। হেসে রতনমণিকে বললেন, কি রে বাবা, যাত্রাফাত্রা নাকি? স্টেশন প্লাটফর্ম শেষে থিয়েটারের স্টেজ না হয়ে যায়।

রতনমণি চেয়ার সরিয়ে পা বাড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলটা টেলিগ্রাফের যন্ত্রটায় ঠেকিয়ে রেখে ডিবে থেকে পান বের করে মুখে পুরলেন। তারপর পান চিবোতে চিবোতেই বললেন, ওদের কাণ্ড।

কি হতে পারে সকলের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল।

বকশি, রতনমণি, ব্যানার্জিবাবু এমন কি খালাসী ভজনলালও এসে জড়ো হলো। পানিপাঁড়ে বিরজুও দরজার আড়ালে। আর এল বি

এস ঘোষালবাবুও তখনই ট্রলি করে ফিরলেন। সটান অফিসঘরে চলে এলেন। যদিও ওঁর কাজ এখানে নয়।

ট্রলিম্যানরা তখন কাঁধে করে ট্রলিটা লাইন থেকে তুলে নামাচ্ছে।

গুরুদাস ওঁকে দেখেই বললেন, যাক বাঁচালেন। একটা মিলিটারি স্পেশাল আসছে। আপনার কথাই ভাবছিলাম!

ঘোষাল হাসলেন গুরুদাসের কথা শুনে। —কি যে বলেন গুরুদাসদা, আমার বউও আর ভাবে না। কপাল ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করলে এল বি এসের কাজ করা যায় না।

ট্রলিতে অবশ্য অনেক লোককেই যাতায়াত করতে হয়। পি ডবলু ডি থেকে ডাক্তার অবধি।

ঘোষাল ভাব দেখালেন যেন কিছুতেই ওঁর ভয় নেই, মৃত্যুকেও নয়। ডাক্তার বড়ুয়ার কথাটাই ভাবুন না। বেচারি।

সবাই চুপ করে গেল। ডাক্তার বড়ুয়ার কথা মনে পড়লেই সবারই মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে। ইয়াং ডাক্তার, সবে চাকরিতে পার্মানেণ্ট হয়ে বিয়ে করেছে। খবর এলো কনস্ট্রাকশনের কুলি ধাওড়ায় কলেরা হয়েছে। ট্রলি নিয়ে ছুটে এলেন, সেই মাঝরাত্তিরেই। ফেরার পথে একটা ইঞ্জিন এসে···

সেই রক্তাক্ত দেহটা সবাই দেখেছিলেন।

ট্রলিম্যানরা বলেছিল, সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে ডাক্তার বড়ুয়াও লাফ দিয়েছিলেন।

ঘোষাল সে-কথা মনে করেই বললেন, কপাল, গুরুদাসদা কপাল। তা না হলে ডাক্তার বড়ুয়ার বেল্ট কখনো ট্রলির চেয়ারে আটকে যায়? অথচ ইঞ্জিনটা উনিই প্রথম দেখেছেন। সবাইকে বাঁচালেন নিজে বাঁচলেন না।

ঐ অ্যাকসিডেণ্টের কথায় ডাক্তার বড়ুয়ার রক্তাক্ত মৃতদেহটা চোখের সামনে ভেসে ওঠায় সারা স্টেশনঘরটাই কেমন গুমোট হয়ে গিয়েছিল।

ঘোষালই হেসে হাল্কা করে দিলেন। বললেন, মরবো না গুরুদাসদা, এত সহজে মরবো না। এখনো কত কি দেখা বাকি।

বকশিও হেসে উঠলো। ঘরের হাওয়াটা হাল্কা করে দিয়ে বললে, এই যেমন স্টেশন প্লাটফর্মে বাঈনাচ দেখা।

বলে চেয়ারগুলো দেখালো।

সবাই হেসে উঠলো ওর কথায়।

ঘরে বসে ওরা চারজন ক্যারম খেলছিল। নীপা আর ইন্দ্র একদিকে, অন্যদিকে অনুপম আর উমা।

অনুপম নীপাকে পার্টনার নিতে চেয়েছিল। নীপা জানে তা হলেই উমা পরে ওকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। —তবে আর কি, পার্টনার তো হয়েই গেছিস।

ওদের সম্পর্কটা যদি সত্যি সত্যি গাঢ় হতো, এসব ইয়ার্কি ঠাট্টা খারাপ লাগতো না। কিন্তু নীপার নিজের মনেই যে এখনো সংশয়।

তাই বাধা দিয়ে ও বলে উঠেছে, না মশাই না, তোমাকে পার্টনার করে আমি হেরে যেতে রাজি নই।

অনুপম ওর দিকে চকিতে চোখ তুলে তাকিয়েছে। কথাটার অন্য কোন অর্থ আছে কিনা ভাবতে চেষ্টা করেছে। আর ওর মুখে একটা বিষণ্ণ ছায়া দেখতে পেয়ে নীপার খুব মজা লেগেছে! ঠোঁটের কোণে হাসি চেপেছে ও।

অনুপম সত্যি ভাল খেলতে পারে না।

নীপা দারুণ ভাল খেলে, অব্যর্থ নিশানা, কিন্তু খেলতে খেলতে বড় অস্থির হয়ে পড়ে।

ও মাঝে মাঝে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে দেখছিল। হঠাৎ আবার তাকাতেই লক্ষ্য করলে প্লাটফর্মের ওপর ফোল্ডিং চেয়ার সারি দিয়ে সাজানো হচ্ছে। দেখেই বলে উঠলো, ফাংশন হবে নাকি ওখানে; এত চেয়ার কেন?

সকলেই উঁকি মেরে দেখলো। একটা রহস্য যেন মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়ালো। তারপর আবার কখন খেলায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

খেলার চেয়েও অনুপমের উপস্থিতিই যেন নীপার ভাল লাগে। ওর আর কিছু চাই না, কিছু না।

নীপার হঠাৎ গতকালের কথা মনে পড়তে নিজের মনেই হাসলো।

গতকাল ডাক্তার হাজরা ওকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন পীচ রাস্তার ধারে, ওঁর সেই ওষুধের দোকানটার কাছে। নীপা ওঁকে বাড়ি অবধি আসতে দেয়নি। বলেছে, এটুকু হেঁটেই চলে যাবো ডাক্তারকাকু।

উমা আর ও হেঁটে ফিরেছে। আর তখনই উমা বলেছে, অনুপম এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করলি না?

ইচ্ছে নীপারও হয়েছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ বোধ করেছে। পারে নি। এমন কি মাকেও না। আগে এমন হতো না, ও কত সহজে প্রশ্ন করতো, অনুপমের খবর জানতে চাইতো। এখন কি জানি কেন ওর বাধো বাধো ঠেকে।

যেন একটা বিশ্ব জয় করে ফিরছে এমনি উচ্ছ্বাসে ও মাকে টাঙা চালানোর কথা বলতে বলতে ঢুকলো।

—মা, আজ একটা দারুণ মজা হয়েছে, জানো মা। বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। —ডাক্তারকাকুর টাঙা চালিয়েছি।

—টাঙা চালিয়েছিস! চারুবালা ভুরু কুঁচকে তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে।

ছেলেবেলায় অনেক প্রশ্রয় দিয়েছেন, এখন আর এ-সব পছন্দ করেন না। চারুবালা শুধু বললেন, তোর বয়েস হয়েছে।

নীপার সব ফুর্তি নিমেষে নিভে গেল।

আর সেখান থেকে সরে এসে ঘরে ঢুকতেই ও অবাক। অনুপম! ভীষণ খুশি হয়ে ওঠার কথা।

কিন্তু নীপা শুধু একবার তাকালো অনুপমের দিকে। ইন্দ্রর সঙ্গে গল্প করতে করতে অনুপমও

নীপা কোন কথাই বলতে পারলো না। ও যে অনুপমকে দেখে খুশি হয়েছে তাও মনে হল না।

ওর মাথার মধ্যে তখন একটা কথাই ঘুরছে। 'তোর বয়েস হয়েছে।' কথাটা কেন বললো মা। অনুপমের জন্যেই কি! ওর হাবেভাবে মা কি কিছু বুঝতে পেরেছে ? কে জানে।

নীপা যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল।

ও ভাবতেই পারে নি অনুপম এসেছে।

মা'র কাছে একটু বকুনি খেলেই ওর মুখ থমথম করে ওঠে, চোখে জল এসে যায়। ওর তখন অভিমান মা'র ওপর। অনুপমের ওপর রাগ। কেন এসেছে ?

ইন্দ্র ক্যারমবোর্ড নামিয়ে খেলতে ডাকলো। অনুপমও।

নীপা গেল না। —আমি খেলবো না।

চারুবালা মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। কিছু বোঝার চেষ্টা করলেন। এতদিন বাদে মেয়েটা ফিরেছে, তাকে হয়তো আঘাত দিয়ে ফেলেছেন এই ভেবে কষ্ট পেলেন। মুখে স্নেহের হাসি এনে মেয়ের পিঠে হাত রাখলেন চারুবালা। —না গেলে খারাপ দেখায়। ছেলেটা কতদূর থেকে এসেছে।

নীপার মুখ শেষ অবধি হেসে উঠলো। ঘোষালবাবুর কোয়ার্টারে গিয়ে উমাকে ডেকে আনলো।

কিন্তু কয়েকটা গেম হয়ে যেতেই উমা চলে গেল। ওর ভয় মা জানতে পারবে। ঘোষালবাবুর স্ত্রী অনুপমের সঙ্গে ক্যারম খেলা, গল্প করা এ-সব পছন্দ করেন না। এমন কি একা একা কোথাও যেতে দেন না। শুধু নীপার ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম। ওঁর ধারণা, নীপা সঙ্গে থাকলে কোন ভয় নেই।

ক্যারমবোর্ড তুলে রেখে নীপা আবার জানালা দিয়ে প্লাটফর্মের দিকে তাকালো। বোধ হয় মিলিটারি স্পেশালটা এসে দাঁড়ানোর কোলাহল শুনে।

বিস্মিত স্বরে বলে উঠলো, এই! দাদা, ছাখ ছাখ!

রোদ পড়ে এসেছে তখন।

অনুপম আর ইন্দ্রও জানালার কাছে এসে উঁকি দিল। তারপর তিনজনই বাগানে বেরিয়ে এলো। ওখান থেকে ভাল করে দেখা যাবে। সাজানো চেয়ারের রহস্য জানা যাবে।

স্পেশাল ট্রেন থেমে গেল।

আর ওরা দেখলো, একপাল নীল ইউনিফর্ম-পরা মেয়ে ট্রেন থেকে নেমে সারি দিয়ে এসে চেয়ারে বসলো।

ইন্দ্র বললে, ওয়াক।

অর্থাৎ ডবলু এ সি।

নীপা মজা করে বলে উঠলো, চব্বিশ ক্যারেট মেমসাহেব রে, দাদা।

এটা নীপার আবিষ্কার। খাস ইংরেজ হলে চব্বিশ ক্যারেট, আমেরিকানরা বাইশ, আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা ওর ভাষায় খাদ মেশানো।

কিন্তু ওরা হাসতেও ভুলে গেল। যেন সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে। ঝকঝকে ফর্সা চেহারা, সুন্দর সুন্দর মুখের মেয়ে, নীল ইউনিফর্ম। সারা প্লাটফর্ম যেন আলো হয়ে গেছে। তিন সারি সাজানো চেয়ারে এসে বসলো সকলে। চুপচাপ ঘাড় সোজা করে বসে আছে।

নীপা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, ঠিক পরীর মত মনে হচ্ছে। নীল পরী।

সত্যি তাই। স্টেশনের সকলেও দূরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

ডবলু এ সি-দের এর আগেও দু-এক দলকে আসতে যেতে দেখেছে। কিন্তু সারি দিয়ে এভাবে বসে স্টেশন আলো করে তুলতে দেখে নি। প্লাটফর্মটা যেন পরীর দেশ হয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন বেল তখন ওদের তদারকি করছে। আর মেজর হুইটলি সোনালী গোঁফের ফাঁকে চুরুট চেপে এক পাশে স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

নীপা ইন্দ্র অনুপম মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল।

তারপরই সেই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা ঘটে গেল।

ট্রেন থেকে একজন ক্যাপ্টেন নেমে দাঁড়িয়েছিল। কাঁধের স্ট্র্যাপে তিনটে করে স্টার। মাথায় ফেল্ট হ্যাট। সে চিৎকার করে কি যেন নির্দেশ দিল। আর ট্রেনের বিভিন্ন কামরা থেকে একদল টমি নেমে এসে প্রায় মার্চ করার ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে নীল পরীদের থেকে একটু দূরে গিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়ালো।

নীপা ইন্দ্র অনুপম তখনো বুঝতে পারে নি। চুপচাপ দেখছিল।

দেখলো কয়েকজন সৈন্য টমিদের প্রত্যেকের সামনে একটা করে এনামেলের গামলা রেখে গেল, আর প্রত্যেকের হাতে একটা করে তোয়ালে। জনকয়েক টমি গামলায় জল ঢেলে দিল।

আর তখনই সেই অভাবনীয় ব্যাপারটা ঘটে গেল।

সারি দিয়ে দাঁড়ানো টমিগুলো প্রথমে ঊর্ধাঙ্গ নগ্ন করলো। তখনো ওরা কিছুই বুঝতে পারে নি।

পরমুহূর্তেই স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই! কি করবে প্রথমটা কিছুই ঠিক করতে পারলো না।

এমন একটা কাণ্ড যে ঘটতে পারে ওদের কল্পনারও বাইরে ছিল। কিংবা ওরা বোধ হয় একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ টমিগুলো ঝটপট প্যাণ্ট ফ্যাণ্ট সব খুলে ফেলে আপাদমস্তক সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গামলার জলে তোয়ালে ভিজিয়ে গা হাত মুছতে শুরু করলো।

নীপা তখনও বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে।

খোলা প্লাটফর্মে সকলের সামনে, বিশেষ করে ঐ নীল পরীদের পাশেই এমন একটা দৃশ্য কল্পনারও বাইরে।

সম্বিৎ ফিরতেই একটা যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো নীপা। লজ্জায় আহত অপমানে ছুটে বাড়ির মধ্যে পালিয়ে এলো। প্রায় কান্নার গলায় বলে উঠলো, ব্রুট, ব্রুট।

কি লজ্জা, ও কি-না বোকার মত অনুপমের পাশে দাঁড়িয়ে, ইন্দ্রর

পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখেছে!'

আশ্চর্য! সারি দিয়ে চেয়ারে বসা নীল পরীরা দিব্যি ঘাড় সোজা করে বসেই আছে। যেন পাশে কি ঘটছে কিছুই জানে না। ধ্যানে বসেছে যেন।

ইন্দ্র আর অনুপম মাথা নীচু করে বাড়ির মধ্যে চলে এলো। মুখ তুলতেও লজ্জা।

কাউকে কিছু না বলে খিড়কির দরজা দিয়ে অনুপম বেরিয়ে গেল। ও জানে, আজ আর মুখ তুলে ও নীপার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তার মুখের দিকে তাকাতে পারবে না।

স্টেশনের সকলেও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। টমিগুলো কাকস্নান সেরে আবার ইউনিফর্ম পরে ট্রেনে উঠলো। ট্রেন ছেড়ে দিল, আর তখন যেন সকলে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

মিলিটারি স্পেশালটা চলে যাওয়ার পরও নীল পরীর দল তেমনি ঘাড় সোজা করে বসেই রইলো। তাদের হাতে হাতে কফির কাপ দিয়ে গেল ক্যাপ্টেন বেল আর মেজর হুইটলির লোকজন।

এমন একটা কুৎসিত দৃশ্য যেন ওদের কাউকেই স্পর্শ করেনি।

মেজর হুইটলি সোনালী গোঁফ নাচিয়ে বোধ হয় একবারই হেসেছিল নীল ইউনিফর্ম-পরা পরীর মত সুন্দর একজনের সঙ্গে কি একটা কথা বলে।

তারপর সন্ধ্যের রাঁচি এক্সপ্রেসটা বরকাকানা থেকে এসে থামতেই নির্দিষ্ট কামরাগুলোয় সারি দিয়ে উঠলো নীল পরীর দল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

বকশি বললে, এর নাম যুদ্ধ।

গুরুদাস কিছুই বললেন না। চাকরিটার ওপরই যেন ঘেন্না ধরে গেছে। গায়ের খাকি ইউনিফর্মটার ওপরও।

শুধু রতনমণি হেসে উঠে বললে, যাঃ বাবা, যেদিক থেকে এলি সেদিকেই ফিরে গেলি, মা-মণিরা।

কেউ হাসলো না।

চার

নীপার পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। আগে ওরা যেখানেই বদলি হয়েছে, স্টেশন প্লাটফর্ম তো কোয়ার্টারের কাছেই, ঐ প্লাটফর্মই ছিল ওর মুক্তির উঠোন! ছোট্ট ছোট্ট স্টেশন, লোকজন নেই, কচিৎ কদাচিৎ একটা ট্রেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো নীপা, রাতের ট্রেনের আলোজ্বলা জানালার চলন্ত দৃশ্যের সঙ্গে নীপাও যেন অনেক দূরে চলে যেত।

এখানে এসেও ওর ঐ একটা নেশা ছিল। ট্রেন দেখা। চারুবালাও এসে জাফরির দরজায় দাঁড়াতেন, চলন্ত ট্রেন দেখতেন। নিঃসঙ্গ জীবনে এও যেন একটা সঙ্গী। ইঞ্জিনের ধোঁয়া, হুইসল, শেষ কামরায় গার্ডের হাতের সবুজ ফ্ল্যাগ, জানালায় জানালায় কত মুখ।

নীপা পায়চারি করতে করতে একবার প্লাটফর্মে চলে এলো। তখন প্লাটফর্ম নির্জন, কেউ কোথাও নেই, ট্রেন আসারও কথা নয়। এঘর ওঘর ঘুরলো। ব্যানার্জিবাবু, বকশিকাকু, ভজনলাল, সকলের সঙ্গেই দু-চারটে কথা। ঈষৎ হাসি। তারপর এসে রতনমণিবাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়ালো।

—সরুন রতনকাকু, আমি একটু টরেটক্কা করবো।

খেলার ছলেই একটু একটু শিখে নিয়েছে নীপা। যখন সত্যি কোন মেসেজ থাকে না, যন্ত্রটা শুধুই টকাটক আওয়াজ করে অন্য স্টেশনের উদ্দেশ্যে, কিংবা চুপ করে থাকে; তখনই নীপা টরে টক্কা টরে টক্কা করে। তা না হলে পাশেই পড়ে থাকা ফালতু যন্ত্রটায় আঙুল টেপে।

গুরুদাস দেখছিলেন। এতদিন কিছু মনে হয় নি। হঠাৎ বললেন, এখন আর স্টেশনটা তেমন নেই রে, হুটহাট করে আসিস না।

রতনমণির দিকে তাকিয়ে বললেন, তাই না রতনমণি ?

তারবাবু রতনমণিও ঘাড় নাড়লেন। বললেন, ঠিকই বলেছেন।

নীপার মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে গেল ও। বুঝতে পারলো ওর পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। সেদিনের সেই বীভৎস দৃশ্যটার জন্যেই কি! নাকি চারপাশে এই সৈন্য সৈন্য সৈন্য, মিলিটারি ট্রাকের দৌরাত্ম্য···

চারুবালার অভিযোগের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেল।—তোর বয়েস হয়েছে।

অতিকায় ঐ ট্রাকগুলোও একটা আতঙ্ক। বেলেল্লাপনার চলন্ত দৃশ্য দেখা যায় কখনো কখনো।

একদিন রাত্রে একটা তীব্র আর্তনাদ শুনেছিল, স্পীডে ট্রাক চলে গেল তখনই। আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছিল, ট্রাকটা গেল পীচ রাস্তা ধরে। একটা তীব্র মেয়েলী গলার আর্তনাদ। কেন বুঝতে পারে নি।

পরের দিন ভোর থেকেই সেখানে জটলা। গিয়ে দেখে দুটো, না, বোধ হয় তিনটে, দেহাতি মুণ্ডা মেয়ে রক্তমাংসের পিণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

ঐ মেয়েগুলো গান গাইতে গাইতে যায়, কিংবা কলকল করে কথা বলতে বলতে। যেন একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। সমস্ত ভুবন ভুলে। সেজন্যেই কি ?

না, ঐ মিলিটারি ট্রাকগুলোর যেন কোন দায়দায়িত্ব নেই। সামনে যাই পড়ুক ওরা থামতেও জানে না। পদে পদে মৃত্যু বলেই হয়তো অন্যের জীবনের কোন দাম নেই ওদের কাছে।

শুধু নীপা নয়, হয়তো সকলেরই পৃথিবী ছোট হয়ে যাচ্ছে।

কোথায় আর যাবে নীপা, কোয়ার্টারের সামনে সেই ছোট্ট বাগানে এসে দাঁড়ালো। ক্যাম্বিশের ডেক-চেয়ারটা নিয়ে এসে ইন্দ্র বসে আছে। তখন সন্ধ্যে নেমেছে।

ওখানে দাঁড়িয়ে পি ও ডবলু ক্যাম্পটার দিকে তাকিয়ে সময় কেটে যায়।

শীতের সময়ে তবু কোয়ার্টার থেকে একটা বাল্ব টেনে এনে সামনের ফাঁকা জায়গাটায় ব্যাডমিণ্টন খেলে। এখন তাও নেই।

কাঁটাতার আর অনেক উঁচু অবধি জালে ঘেরা খাঁচাটায় আলো ঝলমল করছে। রাইফেল কাঁধে টহলদার সৈন্যদের সিলুট ছবির মত দেখাচ্ছে এখান থেকে। প্রিজনাররা হয়তো ঐ খুপরিগুলোর মধ্যে।

অন্ধকার আকাশ। কিন্তু অনেক দূর থেকে, ঠিক মনে হচ্ছে যেন দূর পাহাড়ের আড়াল থেকে তিন চারটে আকাশ-খোঁজা তীব্র সার্চলাইট অবিরত ঘুরছে, ঘুরছে।

হঠাৎ হঠাৎ কখনো অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান থেকে দমকে দমকে কয়েক ছড়া বিদ্যুতের বর্শা শব্দ করে আকাশে মিলিয়ে যায়। নিছকই অকারণে।

নীপা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

—চেয়ারটা নিয়ে এসে বোস না। ইন্দ্র বললে। ডেক-চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসে আছে। ইন্দ্রও ঐ ক্যাম্পের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

দূরে আকাশে মাথা উঁচু করে আছে একটা র‍্যাডার টাওয়ার। কোথাও কোন শত্রুবিমান আসছে কিনা দেখার জন্যে। ঐ তীব্র সার্চলাইটগুলো আকাশ খুঁজছে তন্ন তন্ন করে। একটা সার্চলাইট ঘুরে যাচ্ছে পি ও ডবলু ক্যাম্পের ওপর দিয়ে।

ওদিকটা আলোয় উজ্জ্বল। আর এই স্টেশনে, কোয়ার্টারের দিকে আবছা অন্ধকার। কম পাওয়ারের টিমটিমে আলো। শনিচারীর হাটের দিক, পিছনের পীচ রাস্তা আরো অন্ধকার। একটু দূরের মানুষকেও দেখতে পাওয়া যায় না। দিগন্তরেখার ধারে ধারে পাহাড় আর বন অন্ধকারে মিশে গেছে।

ইন্দ্র হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, বাবার চা পাঠিয়েছিস ?

গুরুদাস স্টেশনের চা খান' না। চারুবালা বাড়িতে বানিয়ে পাঠিয়ে দেন।

নীপা বললে, হ্যাঁ। তোর বুঝি চাই এক কাপ ? বলে হাসলো।

ইন্দ্র বললে, না, অনুপম আসুক। আজ নিশ্চয় আসবে।

নীপা চুপ করে গেল। সেই দৃশ্যটা দেখার পর থেকে অনুপম আর আসে নি। হয়তো খুবই লজ্জা পেয়েছে। নীপা নিজেও। ঐ ঘটনার কথা ওরা কেউ যেন মনে রাখতেই চায় না। ওটা স্মৃতি থেকে মুছে গেলে যেন ভাল হত। নীপার সুন্দর বিশুদ্ধ প্রেম যেন ঐ ঘটনাটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেছে। কিংবা তার শুভ্রতার গায়ে মালিন্য ছিটিয়ে দিয়ে গেছে।

পি ও ডবলু ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীপা কখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

আর তখনই ককিয়ে কেঁদে উঠলো একটা সাইরেনের আওয়াজ।

ইন্দ্র চমকে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

নীপা বলে উঠলো, ও কি, ও কি, অন্ধকার হয়ে গেল কেন ?

আসলে সাইরেন বাজার আগেই বোধ হয় পি ও ডবলু ক্যাম্পের সমস্ত আলো হঠাৎ নিভে গেছে। অন্ধকার।

আর নীপা লক্ষ্য করলো, অনেক দূর থেকে একটা সার্চলাইটের তীব্র আলো ক্যাম্পের ওপর দিয়ে ঘুরছে, ঘুরছে। কি যেন খুঁজছে।

অবাক হয়ে ওরা তাকিয়েছিল।

ক্যাম্পের অন্ধকারে ডুবে যাওয়া খুপরিগুলোর ওপর দিয়ে সার্চ-লাইটের আলোটা ঘুরছে। অন্ধকার বলে আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আর তখনই একটা হল্লা উঠলো ক্যাম্পের দিক থেকে।

—কি ব্যাপার! ইন্দ্রও অবাক।

ঠিক তখনই পর পর রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল। একটানা গুলি ছোঁড়ার। আর সঙ্গে সঙ্গে পর পর কয়েকটা আর্তনার ভেসে এলো। কাদের যেন গুলি করে মারা হচ্ছে।

শব্দ শুনে চারুবালাও বেরিয়ে এলেন। —কি হচ্ছে রে ইন্দ্র? ওঁর গলার স্বরে ভয়ভয় ভাব।

নীপাও বিস্মিত, আতঙ্কিত। —কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, মা। আলো নিভিয়ে দিয়ে কাদের যেন গুলি করে মারছে। ইটালিয়ান প্রিজনারগুলোকে নয় তো?

—বিরজু কিংবা কাউকে ডাক। তোর বাবাকে বাড়ি চলে আসতে বল।

ইন্দ্র হেসে উঠলো। —কোথায় ক্যাম্প, আর কোথায় বাবা। তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন?

দেখা গেল স্টেশনের সকলেও প্লাটফর্মে বেরিয়ে এসেছে। অবাক হয়ে দেখছে।

আর তখনই ক্যাম্পের সব আলো আবার জ্বলে উঠলো। দেখা গেল রাইফেল কাঁধে টহলদার ক'জন ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সৈন্যদের জটলা এক জায়গায়। অথচ কি যে ঘটেছে কিছুই বোঝা গেল না।

গুরুদাস যথারীতি ডিউটি শেষ করে রাত্রে ফিরলেন। সব চাঞ্চল্য তখন শান্ত হয়ে গেছে।

পি ও ডবলু ক্যাম্পে আলো জ্বলে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শান্ত গিয়েছিল।

গুরুদাস সেদিকে তাকিয়ে দেখেছেন, নিত্যদিনের মতই রাইফেল কাঁধে টমি প্রহরীরা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি প্যারেডের ভঙ্গিতে যাচ্ছে, ফিরে আসছে। দূর থেকে দেখা যায় শুধু তাদের ছায়াশরীর।

উনি ফিরে আসতেই চারুবালা প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছিল, কিছু খবর পেলে? অনুযোগ করলেন, অত গোলমাল হল, বাড়িতে ফিরে আসবে তো!

গুরুদাস খাকি ইউনিফর্ম খুলতে খুলতে হাসলেন, আমরাও তো মিলিটারি, কি বল্‌ নীপা। হেসে বললেন, বণ্ড সই করেছি না, বোমা পড়লেও পালাবো না।

একটু থেমে বললেন, এটা পরলে নিজেকে বেশ সাহসী মনে হয়।

নীপা বুশ-কোটটার দিকে তাকালো। সত্যি, এই পোশাকটা পরলেই বাবাকে অন্যরকম লাগে। পোশাকটাই কি মানুষের চরিত্র, না পোশাক চরিত্র বদলে দেয়?

নীপা জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছিল কিছু জানতে পারলে?

গুরুদাস মাথা নাড়লেন। না। নিজের মনেই যেন বললেন, কাল ঐ বেল্‌ কিংবা হুইটলি এলে যদি জানা যায়। বলবে কিনা কে জানে, ব্যাটাদের কিছু জিজ্ঞেস করাও যায় না।

মনে পড়লো, বকশি কি একটা প্রশ্ন করাতে ইণ্ডিয়ান কিউরিওসিটি বলে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিল।

সন্ধ্যের ঘটনা নিয়ে আর কেউ আলোচনা করলো না। কিন্তু সকলের মনের মধ্যেই একটা রহস্য রয়ে গেল।

চারুবালা রান্নাঘরে চলে গেলেন। নীপাও। ও যে-ক'টা দিন এখানে থাকে মাকে সাহায্য করে।

খিড়কির দিকে একটা বড় উঠোন, ছাদ নেই, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে খিড়কির দরজা। নীপা গিয়ে সেটা তালা লাগিয়ে এলো।

দরজার পাশেই কলতলা, ছরছর করে জল পড়ছে। নীপা কলটা বন্ধ করলো। তারপর বারান্দায় মেঝেতে আসন পেতে দিল। বাবা আর দাদা একসঙ্গে খেতে বসে, বসে গল্প করে। চারুবালা আর নীপা সামনে বসে থাকে, এটা ওটা দেয়।

ওদের খাওয়া হয়ে গেলে মা-মেয়ে মেঝেতে সিমেণ্টের ওপরই বসে খায়। নীপা যদি-বা আসন পেতে দেয় মাকে, চারুবালা অভ্যাসবশে সেটা সরিয়ে দিয়ে মেঝেতেই বসে পড়েন।

মেয়েকে কলেজে পড়াচ্ছেন,. এখানে ওখানে যাওয়ার স্বাধীনতা আছে, শনিচারীর হাটে একা একাই, অনুপমের সঙ্গে ক্যারম খেলে গল্প করে, কোথাও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওঁর ধারণা মেয়েদের আসনে বসতে নেই, বাবা কিংবা দাদার খাওয়া হয়ে গেলে তবে খেতে বসতে হয়, অন্যের সামনে মেয়েদের চেয়ারে না বসাই ভাল। মেয়েদের জীবনটাই যেন শুধু কস্ট পাওয়ার জন্যে, কষ্ট সহ্য করার জন্যে। কোন বিলাস কিংবা আরাম হাতের কাছে থাকলেও উপভোগ করতে নেই। ভাল খাওয়া, মাছের মুড়ো, কিংবা মাছের বড় টুকরোটা শুধু পুরুষদের জন্যে।

ছেলেবেলায় নীপা খুব ঝগড়া করতো, কখনো কখনো অভিমান।

রেগে গিয়ে বলতো, দাদাকে রোজ রোজ কেন দেবে? কিংবা, ওটা আমাকে দিলে না কেন?

চারুবালা শুধু হাসতেন।

একবার অভিমানের গলায় নীপা বলেছিল, আমি তো তোমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে।

চারুবালা গুরুদাস দু'জনেই শব্দ করে হেসে উঠেছিলেন।

আসলে সব মায়ের মতই চারুবালারও ভয়, মেয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে জানি না, এখন থেকে কষ্ট সহ্য করতে শিখুক। তুই যে মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, এই পোড়া দেশে।

গুরুদাস তখন ঘরে বসে কি যেন বলাবলি করছেন ইন্দ্রর সঙ্গে। চারুবালা বাসনকোসন তুলে নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের পাশে রেখে দিলেন। কাল সকালে পার্বতিয়া এসে মেজে দেবে।

এর পরও চারুবালার সংসারের কাজ ফুরোয় না। নীপাকেও এটা ওটা করতে হয়।

এখন অবশ্য পার্বতিয়া এসে সকালে উনোনের ছাই ফেলে দেয়, ঘুঁটে কয়লা সাজিয়ে উনোন ধরিয়ে দেয়। শীতকালে তাও হয় না। চারুবালা রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর উনোনের নিভন্ত কয়লা আর ছাই

পরিষ্কার করে ঘুঁটে সাজিয়ে রাখেন্। সকালে শুধু একটু কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বেলে দেওয়া। তা না হলে গুরুদাসকে সময়মত চা খাবার তৈরি করে দেওয়া যায় না। উনি তো সকালেই স্টেশনে ছুটবেন।

বাসনকোসন তোলা হয়ে গেছে। নীপা কলতলায় হাত ধুয়ে গামছায় হাত মুখ মুছতে মুছতে বারান্দায় এলো, এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের ঘেরা বারান্দার দরজা পার হয়ে সবে সুইচ টিপে আলো নেভাতে যাবে, হঠাৎ কি একটা শব্দ হল।

ফিরে তাকালো নীপা। আর সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের গলায় চিৎকার করে উঠলো—বাবা! বাবা!

ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে ভিতরে চলে এলো।

চারুবালাও ততক্ষণে চিৎকার করে ডাকছেন, ইন্দ্র, ও ইন্দ্র।

শব্দটা বোধ হয় ইন্দ্রর কানে গিয়েছিল। চিৎকার শুনেই গুরুদাসও বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

ধপ্ করে ওপর থেকে কি যেন পড়ার শব্দ শুনেই নীপা ফিরে তাকিয়েছিল। তাকিয়েই দেখলো একটা লোক পাঁচিল থেকে উঠোনের ওপর লাফিয়ে পড়েছে।

নীপার মত চারুবালাও ভেবেছিলেন চোর হয়তো। বারান্দার আলোটা টিমটিম করে জ্বলে। কম পাওয়ারের বাল্‌ব। তা ছাড়া বারান্দাটা জালে ঘেরা বলেই উঠোনে চৌকো চৌকো ছায়া পড়ে কেমন রহস্যময় হয়ে থাকে। কিছুই তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না। অথবা ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল বলেই ভাল করে তাকিয়ে দেখে নি।

গুরুদাসও বেরিয়ে এসেছেন ইন্দ্রর পিছনে পিছনে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

সকলেই শুধু দেখছে। সমস্ত ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকছে।

চারুবালা তাড়াতাড়ি তালা চাবি এনে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন। লোকটা যাতে এদিকে না এসে পড়ে।

গুরুদাস সবাইকে দেয়ালের আড়ালে সরিয়ে দিলেন। —সরে আয়, সরে আয়।

অর্থাৎ লোকটা যদি ছুরিটুরি ছুঁড়ে মারে, কিংবা পিস্তলটিস্তল থাকলে……

সবাই তবু উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখলো লোকটাকে। বিস্মিত, স্তম্ভিত!

ফর্সা মুখের লোকটাকে দেখে প্রথমে ভেবেছিলেন মিলিটারি টমি। গৃহস্থ ঘরে হয়তো মদ খেয়ে হামলা করতে এসেছে। সেজন্যেই আতঙ্ক।

চারুবালা নীপাকে ফিসফিস করে বললেন, তুই ঘরে চলে যা।

আতঙ্ক নীপার জন্যেই। ওকে যেন দেখতে না পায়।

গুরুদাসের তখন নিজেকে বড় অসহায় লাগছে। দিনের বেলা ঐসব সৈন্যদের ভয় পান না। হাতে এম পি ব্যাজ লাগানো মিলিটারি পুলিস ঘুরে বেড়ায়, ট্রেন আসার সময়ে স্টেশনেও টহল দেয়। নিজের চোখেই দেখেছেন টমিগুলো ওদের দেখলেই কি ভয় পায়।

—বাবা, ওর পাজামাটা ছাখো। নীপা বলে উঠলো।

সত্যি তো। এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের চৌকো জালের ছায়া সারা উঠোনে, লোকটার গায়েও পড়েছে। তাই ঠিক বুঝতে পারেন নি।

ইন্দ্র সুইচ টিপে উঠোনের আলোটা জ্বেলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে চৌকো ছায়াগুলো উবে গিয়ে লোকটাকে স্পষ্ট করে দেখা গেল।

ডুরে পায়জামা পরা একটা সাহেব। কিন্তু দুটো হাত অনভ্যস্ত নমস্কারের ভঙ্গিতে তুলে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, তারও মুখচোখে যেন ভয়। একটা আতঙ্কের ছাপ তার মুখে। লোকটাও ভয় পেয়ে গেছে।

গুরুদাস ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। চাপা গলায় বলে উঠলেন, প্রিজনার, ইটালিয়ান প্রিজনার মনে হচ্ছে।

ইন্দ্র বললে, হ্যাঁ, ঠিক তাই। ডুরে পায়জামা। মুখ দেখেও…

—কিন্তু ও এলো কোত্থেকে। চারুবালার গলা কেঁপে গেল।

লোকটা হয়তো ভাবেই নি ভিতরে এতগুলো লোকের সামনে পড়ে

যাবে। কিংবা তাড়া খেয়ে পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়েছে, বাঁচবার আশায়।

হাত জোড় করে নমস্কার করার চেষ্টা করলো লোকটা। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখ।

এই ডুরে পায়জামার পোশাকটা সকলেরই চেনা। হয়তো রাত্রে পরে শোয়। খুব সকালে এই পোশাকেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ওরা মগ হাতে কফি নেয় ব্রিটিশ সৈন্যদের কাছ থেকে। দেখে তখন একেবারে ভিক্ষুকের মত মনে হয়। বড় অসহায়। আবার বিকেলে যখন ওদের ইটালিয়ান ইউনিফর্ম পরে সারি দিয়ে দাঁড়ায় তখন অন্য চেহারা।

—ও একটা ফতুয়া পরেছে রে। নীপা বলে উঠলো।

হ্যাঁ, গায়ে ডুরে জামাটা নেই। তার বদলে একটা হিন্দুস্থানী ফতুয়া। বোধ হয় কারো কাছে চেয়ে নিয়েছে, বা কেড়ে নিয়েছে।

লোকটা এক পা এগিয়ে এলো। এগিয়ে এসে হঠাৎ বললে, পিয়েতা। পিয়েতা।

ওরা কিছুই বুঝতে পারলো না।

লোকটা ঝট্ করে হাঁটু গেড়ে নীলডাউন হল। কেমন ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। দুটো হাতে তেমনি অনভ্যস্ত নমস্কারের ভঙ্গি।

কোন পক্ষই কোন কথা বলছে না। চুপচাপ।

গুরুদাস এতই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন যে বাংলায় বলে উঠলেন, কি চাই, কেন এসেছো এখানে?

লোকটা কিছুই বুঝলো না। ভীত সন্ত্রস্ত মুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাতটা নিজের বুকে ঠেকালো। কি যেন বললে।

নীপা ফিসফিস করে বললে, মা চ্যাঁচাবো? রতনকাকুরা এসে পড়বে তা হলে।

ইন্দ্র লোকটাকে ভাল করে দেখবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। চারুবালা বললেন, এই, যাস না। পিস্তলটিস্তল আছে কিনা কে জানে।

একপাশে সরে গিয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে দেখছিল ওরা। তখনো ভয়।

—মা, চ্যাচাবো ?

—না না, দাঁড়া দেখি। চারুবালা বিপদের মুখেও বুদ্ধি হারান না। গুরুদাসকে বললেন, তুমি ওকে চলে যেতে বলো।

তারপর নিজের মনেই যেন বললেন, চ্যাচামিচি করে লাভ নেই। ওরা যদি এসে দেখে ঘরের মধ্যে একটা সাহেব ঢুকেছে, মিলিটারির···

অর্থাৎ আড়ালে অপবাদ রটাতে পারে। হয়তো ভেবে বসবে ওরা আসার আগেই কোন হামলা করেছে। বাড়িতে নীপার মত একটা মেয়ে। শেষে, ছিঃ ছিঃ, যদি কিছু বলাবলি করে ওরা।

এত সব কথা বোধ হয় ভাবেন নি চারুবালা। শুধু মনে হয়েছে লোক জানাজানির আগেই যদি চলে যায় ও।

—গো অ্যাওয়ে, গো অ্যাওয়ে। ইন্দ্র বললে।

লোকটার চোখ দুটো করুণ প্রার্থনার মত কি যেন বলতে চাইলো।

বুকে হাত ঠেকিয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে হঠাৎ বললে, প্রিজোনার। সেভ।

অন্তত ইন্দ্রর তাই মনে হল।

লোকটা বোধ হয় ইংরেজী জানে না। কিংবা দু'একটা শব্দই শিখেছে।

আবার বললে, পিয়েতা।

গুরুদাসের তখন বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে। কি করা যায় কিছুই বুঝতে পারছেন না। লোকটার কাছে রিভলভার আছে কিনা তাও জানেন না।

লোকটার মুখচোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ভীষণ ভয় পেয়েছে। ওদেরই ভয় পাচ্ছে হয়তো। অথচ ওঁরাও লোকটাকে ভয় পাচ্ছেন। দু'পক্ষই পরস্পরকে ভয় পাচ্ছে।

সন্দেহ নেই ইটালিয়ান প্রিজনার। ও তো নিজেই বলছে প্রিজোনার।

—কি করা যায় বল তো! হতাশার গলায় বললেন গুরুদাস।

চারুবালা বললেন, কি আবার করা যাবে, লোকটাকে তাড়িয়ে দাও।

আর ঠিক তখনই নীপা বলে উঠলো, লোকটা নয় মা, ছাখো ছাখো, মুখটা একেবারে ছেলেমানুষের মত।

গুরুদাসও বলে উঠলেন, সত্যি তাই। একেবারে বাচ্চা ছেলে! ইন্দ্রর মতই, কিংবা আরো কম বয়েস। চেহারাটাই যা একটু বড়োসড়ো।

চারুবালার কানেও গেল না ওসব কথা। হাতে চলে যাওয়ার ইশারা করে হিন্দিতে বললেন, এই হট যাও, চলে যাও হিঁয়াসে।

এমন একটা বিমূঢ় অবস্থার মধ্যেও ইন্দ্র হেসে ফেললো।

ছেলেটা হয়তো কিছু বুঝলো। আবার হাত জোড় করলো। ঐটুকুই হয়তো কারো কাছে শিখেছে।

চারুবালা অসহায় কণ্ঠে বললেন, জ্বালালে।

আর ইন্দ্র বললে, বাগান থেকে একটা ইঁট নিয়ে এসে ধাঁই করে মারলে হয়…

গুরুদাস বললেন, না না, ওসব করতে হবে না। কি থেকে কি হয়। তা ছাড়া ইনজিওর্ড হলে…

ইন্দ্র ক্ষোভের স্বরে বলে উঠলো, ব্যাটা ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসেছে। ইনজিওর্ড হলেই বা কি, ব্রিটিশ সোলজাররা পেলে তো এক্ষুনি গুলি করে মারবে।

—গুলি করে মারবে? নীপার গলার স্বর কেমন কেঁপে গেল। —কেন, মারবে কেন?

গুরুদাস কি যেন ভাবলেন। বিড়বিড় করে বললেন, না না, তা বোধ হয় করে না। হয়তো কিছু শাস্তি দেয়…

আসলে উনি তো আইনকানুন কিছু জানেন না। কেমন একটা ভাসাভাসা ধারণা শুধু। আইন থাকলেও তা ওরা মানে কিনা তাও জানেন না।

কিন্তু লোকটাকে তো তাড়াতে হবে। এত রাত্রে কি করবেন তাও ঠিক করতে পারছেন না।

ভিক্ষে চাওয়ার মত লোকটা এবার দু' হাত পেতে কি যেন চাইলো। বললে, আকুয়া।

ওরা কিছুই বুঝতে পারলো না।

—কি চাইছে রে দাদা? নীপা জিজ্ঞেস করলো।

লোকটা ভুরু কুঁচকে কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে। আবার বললে, আকুয়া। আকুয়া। তারপরই হয়তো মনে পড়ে গেল। বললে, ওয়াতার।

—ওয়াটার? ইন্দ্র বললে।

লোকটা এমনভাবে মাথা নাড়লো যেন বলতে চাইলো, ঠিক, ঠিক!

দেখে মনে হল খুবই তৃষ্ণার্ত, হয়তো ভয়েই গলা শুকিয়ে গেছে।

ইন্দ্র এগিয়ে এসে জাল-বারান্দার এপার থেকে আঙুল দেখাল, খিড়কির দরজার পাশে কলতলার দিকে। তখন আর লোকটাকে কারোর অত ভয় নেই।

লোকটা ফিরে তাকাল পিছনদিকে, ইন্দ্রর আঙুল লক্ষ্য করে। তারপর কলটা দেখতে পেয়েই ছুটে গেল। কল খুললো।

গুরুদাস এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। লোকটার অসহায় অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, কেন মরতে পালিয়ে এসেছিস, তুই তো ধরা পড়বিই। নীপার দিকে, ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। —জানে না ভারতবর্ষ কত বড় বিশাল দেশ।

ইন্দ্র বললে, তাও যদি ইংরিজি জানতো।

ঠিক তখনই নীপা খিলখিল করে হেসে ফেলেছে। বলছে, কাণ্ড দেখো, কাণ্ড দেখো ওর। একেবারে আনাড়ি।

সত্যি তাই। কল খুলতেই তোড়ে জল। লোকটা দু' হাতের আঁজলায় জল ধরে খেতে চেষ্টা করছে, পারছে না। পাজামা ফতুয়া ভিজে যাচ্ছে।

নীপা বারান্দায় শেলফে রাখা অ্যালুমিনিয়মের গ্লাসটা নিয়ে এসে মাকে বললে, দেবো?

চারুবালা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। যত ভয়ঙ্করই হোক, এমন কি শত্রু হলেও তৃষ্ণার্ত মানুষকে জল দেবে না তা কি সম্ভব !

বারান্দার শেলফে ওগুলো পার্বতিয়ার জন্যে। থালা, গেলাস, বাটি। একটা কলাইকরা থালা, এনামেল উঠে গেছে. কোথাও কোথাও। বাটিটাও এনামেলের।

টোল খাওয়া অ্যালুমিনিয়মের গ্লাসটা হাতে নিয়ে নীপা ডাকলো, এই !

লোকটা ফিরে তাকালো।

আর নীপা অ্যালুমিনিয়মের গ্লাসটা চৌকো জালের যেখানটা ভেঙে অনেকখানি ফাঁক হয়ে গেছে তার ভিতর দিয়ে গলিয়ে ছুঁড়ে দিল।

গ্লাসটা শব্দ করে গড়িয়ে গেল।

সেটা দেখেই লোকটা ওদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, গ্রাৎজি, গ্রাৎজি।

ছুটে এসে গ্লাসটা তুলে নিল। সেটা কলের নীচে ধরে ধুয়ে নিল, আর পর পর দু' তিন গ্লাস জল ভরে নিয়ে এমন ভাবে ঢকঢক করে খেল, যেন ওর মধ্যে একটা অনন্ত পিপাসা জমা হয়ে আছে।

লোকটা আবার গ্লাসটা জলে ধুয়ে কল বন্ধ করলো, ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো, গ্লাসটা ফেরত দেবার জন্যে হাত বাড়ালো।

কিন্তু কেউই ওটা নেবার জন্যে এগোলো না।

চারুবালা হাতের ইশারায় বোঝালেন, ওখানেই থাক।

গুরুদাস বললেন, কীপ ইট দেয়ার।

নীপা হেসে বললে, হ্যাঁ, সব বুঝছে। অর্থাৎ ও কি ইংরেজী বুঝবে !

লোকটা অবাক হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকালো। গ্লাসটা কেন ফেরত নিচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। তাই সেটা জালের ধার ঘেঁষে নামিয়ে রেখে ক্লান্ত পা টেনে টেনে উঠোনের মাঝখানে বসে পড়লো।

গুরুদাস আবার বললেন, গো অ্যাওয়ে, প্লীজ গো অ্যাওয়ে।

লোকটা আবার জোড় হাতে নমস্কার করার ভঙ্গি করলো, আর মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে ইশারায় বোধ হয় বলতে চাইলো, কথা বোলো না।

গুরুদাসের মনে পড়লো লোকটা একবার বলেছিল, সেভ। অর্থাৎ সেভ মি, আমাকে বাঁচাও।

লোকটা আবার বললে, প্রিজোনার।

তবে আর কি, মাথা কিনে নিয়েছিস। গুরুদাস বিব্রত বোধ করলেন। লোকটার ওপর রাগও হল। দূর থেকে স্টেশনঘরে বসে বসে, কিংবা এই কোয়ার্টারের বাগান থেকে পি ও ডবলু ক্যাম্পের আকাশ-ছোঁয়া জালের আর কাঁটা-তারের খাঁচার মধ্যে ঐ প্রিজনারদের দেখে মায়া হত। সেটা ইংরেজদের ওপর অক্ষম রাগ থেকেই কি না কে জানে। আমরা তো পারছি না, জার্মানী ইটালী আর জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে যদি ইংরেজরা হেরে যায় তা হলে স্বাধীনতা এসে পড়তে পারে। কিছু না হোক, ব্রিটিশ তো জব্দ হবে!

কিন্তু এখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। যাদের জন্যে এত মায়া, এখন তাদেরই একজন প্রচণ্ড আতঙ্ক।

একজন যুদ্ধবন্দী পালিয়ে এসে আমারই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে।

এখনই হয়তো খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে। মিলিটারিতে সারা রেল চত্বরই ঘিরে ফেলেছে কিনা কে জানে। হয়তো এখনই দরজায় টোকা পড়বে।

গুরুদাসের বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি। ঢিপ ঢিপ শব্দটা যেন কানে শুনতে পাচ্ছেন। উনি তো আবার নিজেও বণ্ড সই করেছেন, লান্স নায়েকের র‍্যাঙ্ক পেয়েছেন। ইউনিফর্ম পরেন, কাঁধে র‍্যাঙ্কের চিহ্ন আঁটা—আই ভি। কে যেন বলেছিল সেকেণ্ড লেফটেনেণ্টও হয়ে যেতে পারেন। তখন কাঁধের স্ট্র্যাপে একটা স্টার বসে যাবে, টুপিতে। না ওসবের লোভ নেই গুরুদাসের। উনি তো চাকরিতেই উন্নতির চেষ্টা করেন নি কখনো।

কিন্তু এখন তো চোখের সামনেই বিপদ।

লোকটা হঠাৎ দুটো হাত মাথার নীচে রেখে উঠোনে সিমেণ্টের ওপরই শুয়ে পড়লো। চোখ আকাশের দিকে। উঠোনটা খোলা আকাশের নীচে, শুধু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

গুরুদাস অস্ফুটে বললেন, কি যে করা যায়।

ঘরে টেলিফোন আছে, কিন্তু রেলের টেলিফোন। একমাত্র পাশের কোয়ার্টারের এল বি এস ঘোষালবাবুকে ফোন করে জানানো যায়। কিংবা স্টেশনে। এখন আর কেউ আছে কিনা তাও জানেন না। তাছাড়া, চারুবালার কথাটা মনে পড়লো। এ তো একটা বিচ্ছিরি স্ক্যাণ্ডাল। মিলিটারি ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন বেল কিংবা মেজর হুইটলিকে খবর দেবারও উপায় নেই। এই টেলিফোনের সঙ্গে মিলিটারির টেলিফোনের সরাসরি যোগাযোগ নেই।

তাই মনের ক্ষোভেই বললেন, মিলিটারি ক্যাম্পে একটা খবর দিতে পারলে হত।

উনি এখন বিপদ থেকে উদ্ধার চাইছেন। শেষে ওঁকেই না ফিফথ কলম বা কুইসলিং বলে ধরে। একটা পলাতক যুদ্ধবন্দীকে আশ্রয় দিয়েছেন। এটা ওয়ার-টাইম। উনি নিজেও, হোক না আই ই, রেলের লোক, কিন্তু একজন লান্স নায়েক।

নীপা বললে, এই বয়সে কেন যে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলি···

চারুবালা সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটে বললেন, কোন্ দুঃখী মাকে কাঁদিয়ে এসেছিস, তুইই জানিস বাবা। আমার ইন্দ্রের মত বাচ্চা শিশু···

আসলে চারুবালার এখন আর তেমন ভয় করছে না। বুঝতে পেরেছেন, লোকটাই বাঁচতে চাইছে। স্বামীর বুকের মধ্যে কি তোলপাড় চলছে তাও টের পান নি। উনি অতশত বোঝেনও না। ওঁর কাছে শুধু একটাই সমস্যা। যুদ্ধবন্দী হলেও সাহেব, একটা বাইরের লোক, হুট করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে এই রাত্তিরবেলা। এখন কত

রাত্তির কে জানে। বাড়িতে নীপার মত মেয়ে। সবাই বলে সুন্দর। এই বয়েস। একটা কিছু বলে দিলেই হল।

চারুবালা বললেন, আমার ইন্দ্রের মত বাচ্চা শিশু···

ইন্দ্র হেসে ফেললো।

নীপা বললে, শিশুই তো। ছাখ তুই, কি সরল মুখ, একেবারে শিশুর মত। হয়তো ভাল করে গোঁফই ওঠে নি।

তা হয়তো নয়। কিন্তু সত্যি বড় কচি নিষ্পাপ সত্যযুবক মুখ, যেন একটুক্ষণ আগে কৈশোর পার হয়েছে। ইটালিয়ান বলেই চেহারা যা একটু লম্বা, একটু স্বাস্থ্যবান।

লোকটা উঠোনে শুয়ে আছে, মাঝে মাঝে ওদের দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে।

বারান্দার দরজায় একটা চাব্‌স-তালা লাগিয়ে দিয়েছেন চারুবালা। আলিগড়ের নয়, খোদ রেল কোম্পানির বিলিতি চাব্‌স-তালা। ওর সাধ্য নেই ভেঙে ঢোকে। তাই চারুবালা নিশ্চিন্ত।

বললেন, চলো ঘরে চলো, সারারাত কি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি এখানে ?

কিন্তু ঘরে এসেও কি শান্তি আছে। গলায় লাগা মাছের কাঁটার মত, ঢোক গিলতে গেলেই জানান দেয়। অস্বস্তি, অশান্তি।

গুরুদাস বললেন, জি আর পিকে ফোন করে জানালে হয়···

আর তখনই নীপা বলে উঠলো, না না বাবা, ধরিয়ে দিও না। ও ঠিক নিজেই চলে যাবে। ও তো আমাদেরও ভয় পাচ্ছে।

চারুবালা বললেন, রাত্রে কোন হট্টগোল করে দরকার নেই, যা করতে হয় সকালে করো।

—কিন্তু ও যদি পালিয়ে যায়, আর পরে জানাজানি হয় রাত্তিরে এখানে প্রোটেকশন পেয়েছিল, জানিস না এটা কত বড় অফেন্স।

ইন্দ্র বললে, পালাবে কোথায়, বেরোলেই তো এক্ষুনি ধরা পড়বে। হয়তো মিলিটারি পেট্রোল বেরিয়ে পড়েছে···

চারুবালা চুপচাপ বসে ছিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোর বাবা-মা কি দোষ করলো বল তো! তারা হয়তো কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

গুরুদাস তখন নিজের বিপদের কথা· ভেবে বিব্রত। ঈষৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, তুমি তোমার মায়াকান্না রাখো তো। আগে নিজে বাঁচি।

ইন্দ্র উঠে গিয়েছিল লোকটা এখনো শুয়ে আছে কিনা দেখতে। দ্রুত পায়ে ফিরে এলো।—বাবা, লোকটা জালের কাছে এসে আমাদের দিকে উঁকি দিয়ে দেখছিল।

নীপা বললে, আমরা ওকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি কিনা সেই ভয়ে হয়তো।

চারুবালা বললেন, পিস্তলটিস্তল নেই তো, দেখেছিস?

কেউ কোন কথা বললো না।

গুরুদাস যেন বুকের মধ্যে একটা অসহ্য কষ্ট চেপে রেখেছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ও এখন চলে গেলেও বিপদ। ধর, পাঁচিল থেকে লাফিয়ে নামলো, কেউ কোথাও দেখতে পেল···

নিজের মনেই বললেন, ওয়ার প্রিজনারকে প্রোটেকশন দেওয়া।

নীপাও ভয় পেয়ে গেল। বাবার বিপদের কথাটা ও এতক্ষণ ভাবেই নি। বিপদের গুরুত্ব বোঝে নি!

গুরুদাস হঠাৎ বললেন, ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে আটকে রাখতে পারলেই ভাল হত। কাল সকালেই মেজর হুইটলিকে খবর দিতাম।

ইন্দ্র বললে, ঐ কোণার ঘরটায় ওকে শুতে বললে হয়। যেই যাবে তালাচাবি দিয়ে দেব।

গুরুদাস বললেন, ঠিক বলেছিস। ওকে তালাচাবি দিয়ে আটকে রেখে যদি খবর দিই, তা হলে তো আর আশ্রয় দেওয়া হল না।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কি ভাবে তা করা সম্ভব ভেবে কুলকিনারা পেল না।

এই বাড়িটা কেমন আনন্দে ফুর্তিতে ছল। একটা সুখী সংসার। অথচ ছোট্ট একটা ঘটনায় সমস্ত আনন্দ উবে গেছে। বুকের মধ্যে শুধু ভয়।

হঠাৎ সবাই চুপ করে গেল। কান সজাগ করে রইলো। গুরুদাস প্রথমে ভেবেছিলেন, ভেবে আঁৎকে উঠেছিলেন, সদর দরজার দিক থেকে নয় তো? মিলিটারির লোক? খোঁজে বেরিয়েছে?

না, ঐ লোকটাই যেন চাপা গলায় ডাকছে, সিনিওর। মিস্তার।

ওঁরা সবাই বেরিয়ে এলেন।

লোকটা ফতুয়া তুলে পেট দেখালো।—পানা, পানা!

ওরা কিছুই বুঝলো না। শুধু মনে হল কিছু খেতে চাইছে।

লোকটা হাসলো, নিজের বুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ফ্রেন্দ্।

—কি বলছে? গুরুদাস ইন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন।

ইন্দ্র বললে, কি জানি, বোধহয় ফ্রেণ্ড।

লোকটা আবার বললে, ইতালিয়ানো ফ্রেন্দ্। হাসলো—ইন্দিয়া ফ্রেন্দ্।

ওরা হেসে ফেললো।

নীপা নিজের শরীরটাকে কপাটের আড়ালে রেখে উঁকি দিয়ে দেখছিল। বললে, ফ্রেণ্ড হয়ে কাজ নেই, মানে মানে বিদেয় হও।

গুরুদাস হঠাৎ চারুবালাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতটাত আছে কিছু?

নীপা ইন্দ্র দুজনেই অবাক হয়ে গেল। এত বিপদের মধ্যেও বাবার মনে কি ওর জন্যে মায়া। মা'র মত?

চ্যরুবালা ঘাড় নেড়ে বললেন, পার্বতিয়ার জন্যে তো রাখা থাকে। বারান্দার কোণের দিকে দেখালেন। সেখানে হাঁড়ি কড়াই জড়ো করা আছে।

গুরুদাস ইন্দ্রর দিকে ফিরে বললেন, পারবি? ঐ ঘরে খেতে দিবি, যেই খেতে বসবে···

ইন্দ্র ঘাড় নেড়ে বললে, পারবো।

সঙ্গে সঙ্গে গুরুদাস বললেন, আর ইউ হাংরি ?

লোকটা বোকার মত তাকিয়ে রইলো, বুঝতে পারলো না, কিংবা অবাক হয়ে গেছে এতখানি সহানুভূতি পেয়ে।

ইন্দ্র প্রশ্ন করলো, ফুড ? ফুড ?

লোকটা হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছে, চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

সেও প্রশ্ন করলো, ফুদ ?

আসলে লোকটা সারাদিন হয়তো পালাবার ধান্দা করেছে। খাওয়া হয় নি। ক'দিন খায় নি কে জানে !

সন্ধ্যেবেলা সেই আলো নিভে যাওয়া, গুলির আওয়াজ, আর্তনাদ, সব মনে পড়ে গেল নীপার।

গুরুদাসই বারান্দার দরজার তালাচাবি খুললেন। —কাম। কাম হিয়ার।

কোণের ঘরে নীপা খাবার নিয়ে গেল। রাত্রের উদ্বৃত্ত ভাত ডাল। পার্বতিয়ার জন্যে রাখা থাকে।

আসনও বিছিয়ে দিলো নীপা। আর পার্বতিয়ার এনামেলের থালা বাটিতে ভাত ডাল তরকারি। সন্ধ্যের সময় বানানো শুকনো দুখানা রুটি। অ্যালুমিনিয়মের গ্লাসে জল।

ইন্দ্র হাতছানি দিয়ে ডাকলো ওকে।

লোকটা খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো। আর বোকার মত যেদিকে আসন তার উল্টো দিকে মেঝেতে বসে পড়লো।

মুখচোখ দেখে বোঝা গেল বেশ ক্ষুধার্ত।

নীপা তারই মধ্যে হাত ধোবার মগে করে এক মগ জল রেখে দিয়েছে ঘরের কোণায়।

তারপর দরজার আড়াল থেকে রসিকতা করে বললে, খাও সাহেব খাও, দিশি রান্না খেয়ে নাও।

গুরুদাস নিজের মনেই বললেন, ফাঁসির খাওয়া। কাল সকালেই তো ধরা পড়বি।

লোকটা রুটি দুখানা তুলে তাকালো ওদের দিকে।—পানা। পানা।

হাসলো।

শুকনো ভাতগুলো দেখে খুব খুশি। অবাক হওয়ার স্বরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলো, রিৎসি?

বলে ফিরে তাকিয়েছে।

আর তখনই ওরা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। পলকের মধ্যে দরজাটা বন্ধ করে তালাচাবি লাগিয়ে দিয়েছে ইন্দ্র।

পাঁচ

একটি বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, বিপর্যয়। অথচ বাইরের পৃথিবীতে সেই একই দৈনন্দিনতা।

গুরুদাস নিত্যদিনের মতই সকালে একবার স্টেশন থেকে ঘুরে আসেন। কেউ গুরুদাসের খোঁজ করলে চারুবালা রসিকতা করে বলেন, বৈঠকখানায়। কথাটা মিথ্যে নয়। এ-সময়ে কোন কোনদিন উনি একেবারে সাধারণ পোশাকে চলে আসেন। কারণ এ-সময় কোন ট্রেন নেই, কোন যাত্রীও আসে না। প্লাটফর্ম একেবারে নির্জন নিথর। মিলিটারির লোকরাও আসে না।

আজ কি মনে হতে খাকি ইউনিফর্ম পরলেন, বুশকোটের থলির মত দু'পকেটের পিতলের বোতাম আঁটলেন। দু'কাঁধে পিতলের আই ই অক্ষর দুটোয় হাত বুলিয়ে দেখে নিলেন ঠিক আছে কিনা। ওঁর বোধহয় কেবলই মনে হচ্ছিল জীপে করে ক্যাপ্টেন বেল বা মেজর হুইটলি এসে পড়বে। অথবা অন্য কোন মিলিটারি অফিসার। কিংবা এমনও হতে পারে এই খাকি পোশাক পরে নিজের গুরুত্ব বাড়াবার চেষ্টা করছিলেন, সাহস সঞ্চয় করছিলেন।

রাত্রে ঘুমোতে পারেন নি, কেউই ঘুমোয় নি। চারজনে মুখোমুখি বসে নানান জল্পনা কল্পনায় রাত কেটে গেছে।

ঐ ভয়ঙ্কর আগন্তুককে কোণের ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্দী করে রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। কেবলই মনে হয়েছে মিলিটারি সৈন্যদের কেউ যে-কোন মুহূর্তে এসে কড়া নাড়বে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন কড়া নাড়লেই হাসতে হাসতে গিয়ে বলবেন, আই হ্যাভ মেড হিম এ প্রিজনার এগেন। তারপর ঘরটা দেখিয়ে দেবেন।

কিন্তু লোকটার ব্যবহার বড় অদ্ভুত লেগেছে ওঁর।

রাত্রে ওঁরা যখন দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় মুখোমুখি জেগে বসে আছেন, নীপা হঠাৎ বলেছিল, লোকটার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছিল, না রে দাদা।

ইন্দ্র শুধু মাথা নেড়েছিল।

আর নীপা বললে, ভাত ডাল দেখে চোখমুখ এমন হল। কি গোগ্রাসে গিলছিল যদি দেখতে মা।

হ্যাঁ, গুরুদাসও দেখেছেন। যেন কতদিন খায় নি। ভাতগুলো মুঠো মুঠো করে খেলো, তারপর ডালটা চুমুক দিয়ে খেল বাটি থেকে।

ভাত যে ডাল মেখে খেতে হয় জানে না। সে-কথা ওকে বলার সুযোগও ছিল না। তখন তো ওরা ওর খাওয়ার কথা ভাবছে না, ভাবছে কি ভাবে ঝট করে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দেবে।

উনি লক্ষ্যও করেন নি। নীপাই বললে, খেতে পেয়ে এমনভাবে তাকালো, জানো বাবা, যেন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। যেন আমরা ওর কত বন্ধু।

গুরুদাসের সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে তালাচাবি দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেবার পর।

ওঁরা তখন সকলেই নিশ্চিন্ত। যেন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছেন। এখন খবর দিয়ে দিতে পারলেই মেজর হুইটলি সোনালী গোঁফ নাচিয়ে ধন্যবাদ জানাবে। হয়তো পিঠ চাপড়ে বুদ্ধির প্রশংসা করবে। বলা যায় না, পুরস্কারটুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন।

কথাটা মনে উঁকি দিতে নিজেরই খারাপ লাগলো। নিজেকেই যেন ধমক দিলেন, এসব লোভের কথা আমার মনে এলো কেন? না, ওসব ফাঁকা পুরস্কারে ওঁর লোভ নেই। ওটা তো পাপের পুরস্কার। একটা ভীত সন্ত্রস্ত মানুষকে বিট্রে করেছি যেন। না, গুরুদাস নিজেকে বোঝালেন, আমি তো শুধু নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছি। চাকরিতে উন্নতির চেষ্টা করি নি, ডি অফ আইয়ে জয়েন করেছি ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে। ওদের পড়ার খরচের কথা ভেবে।

নিজেকে বিক্রি করেন নি। মুভমেণ্টের খবর যখন কাগজে পড়তেন, রাতারাতি নেতাদের অ্যারেস্ট করার খবর, তখন উনিও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। মনে মনে চাইতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হোক। অক্ষম অসহায় মানুষ, যাকে সংসার আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে, সে এর বেশি আর কি করবে।

বক্শি একদিন কানে কানে বলেছিল, খবর শুনেছেন গুরুদাসদা? সুভাষ বোস নাকি জাপান থেকে রেডিওয় বক্তৃতা দিয়েছেন।

শুনে প্রৌঢ় বয়সেও ওঁর রক্ত চনমন করে উঠেছিল।

—বাবা।

গুরুদাস বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। লোকটাকে কোণের ঘরে চাবি দিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন বলেই অন্য কোথায় মন চলে গিয়েছিল। নীপার কথায় ঘোর কেটে গেল।

নীপা বললে, বাবা, লোকটা বোধহয় আমাদের খুব বিশ্বাস করেছে।

গুরুদাসেরও তাই মনে হল। মনে হল বলেই খারাপ লাগলো।

উনি তো অবাকই হয়েছিলেন। একটা লোককে হঠাৎ ঘরের দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে দেওয়া হল। অথচ লোকটা ছুটে এসে দরজা খোলার চেষ্টা করলো না, উঠে এসে সিনিওর বলে ডাকলো না। কোন অনুনয় করলো না।

সে-কথা ভেবেই বড় আশ্চর্য লাগছিল গুরুদাসের।

কিন্তু এখন তো ওঁর সামনে অনেক বড় একটা দায়িত্ব। খবর দিতে হবে, পলাতক বন্দীটাকে উনি ধরে রেখেছেন।

সারারাত ওঁরা ঘুমোতে পারেন নি। শুধু ভোরের দিকে কেমন তন্দ্রা মত এসেছিল।

ভেবেছিলেন, সকালে উঠেই দেখবেন সমস্ত স্টেশন এলাকা টমি সৈন্য আর মিলিটারি পুলিসে ভরে গেছে।

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখলেন কোথাও কিছু নেই। প্রতিদিনের মতই প্লাটফর্ম নির্জন, আকাশের দিগন্তসীমায় কুয়াশা মাখা পাহাড়ের

আড়াল থেকে সূর্য উঠেছে, দূরের শাল-মহুয়ার বন যেন একটু একটু করে ঘোমটা তুলছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে রোদ্দুর লেগে।

আর সেই পি ও ডবলু ক্যাম্প নিত্যদিনের মতই। বিশাল উঁচু তারের জাল আর কাঁটা তারের বেড়ার ওপারে রাইফেল কাঁধে ব্রিটিশ টহলদার সৈন্য, আর শ্যাওলা রংয়ের সারি সারি খুপরি, কাঠ আর ক্যানভাসের সারি সারি তাঁবুর মত। যেন শ্যাওলা সবুজ তাঁবু। ইটালিয়ান প্রিজনাররা তখনও সারি দিয়ে এসে দাঁড়ায় নি। আরেকটু পরেই হয় তো যথারীতি আসবে, ডোরা কাটা জামা গায়ে, ডোরা কাটা পাজামা পরে। হাতে কফির মগ নিয়ে।

গুরুদাস ইউনিফর্ম পরে এসেছেন, মেজর হুইটলি কিংবা ক্যাপ্টেন বেল সাত সকালে আজ এসে পড়বে ভেবে নিয়েই। এসে পড়লে উনিও নিশ্চিন্ত। তা না হলে ওঁকেই খবর পৌঁছে দিতে হবে। অথচ ঐ ক্যাম্পের দিকে যাওয়া নিষিদ্ধ। সিভিলিয়ানদের তো কথাই নেই, ওঁরাও যেতে পান না।

কিন্তু তার আগেই কি বকশি কিংবা রতনমণিকে বলবেন? রাত্রের সব ঘটনা। জানতে তো পারবেই। হুইটলিকে বলার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় রাইফেলধারী সোলজাররা এসে বাড়িটা গার্ড দেবে। লোকটাকে নিয়ে যাবে। তখন সবাই বলবে আমাকে বললেন না? এত বড় একটা ঘটনা চেপে রাখলেন।

কিন্তু বকশি প্রচণ্ড জার্মানভক্ত। মুরী গেলেই সামন্ত সাহেবের বাংলোয় গিয়ে বার্লিন রেডিও শোনে। সামন্ত সাহেবের ছেলেকে পড়াতো একসময়, তা থেকেই ঘনিষ্ঠতা।

গুরুদাসেরও অবশ্য ইচ্ছে হয়। কিন্তু ডাক্তার হাজরা ছাড়া আর কারো বাড়িতে রেডিও নেই। দু-একজন ঠিকাদারের বাড়িতে আছে, কিন্তু ওদের বিশ্বাস করেন না।

বকশিকে বলবেন কি সব কথা? কিন্তু ওর তো বড় বেশি মায়া। কথায় কথায় বলে, ইংরেজ ব্যাটারা ফর্সা, কিন্তু ইটালিয়ানদের মত সুন্দর নয়। দেখেছেন কি সুন্দর দেখতে, কখনো বলে বসে, দেবতুল্য।

বকশি যদি বলে, কি আশ্চর্য, ধরিয়ে দেবেন ? ছেড়ে দিন গুরুদাসদা ছেড়ে দিন, পালাতে পারে তো পালাক না।

তখন বড় মুশকিলে পড়ে যাবেন গুরুদাস। হুইটলিকে বলে লোকটাকে তার পরও যদি ধরিয়ে দেন, ওরা হয়তো সবাই বলবে ট্রেটর। বিশ্বাসঘাতক। সে তো সাজ্ঘাতিক অপমান।

গুরুদাস অত রাজনীতি বোঝেন না। এই যে বিয়াল্লিশে বিদ্রোহ হয়ে গেল, কত রকম কথাই শুনলেন। কোনটা ভুল কোনটা ঠিক বুঝতে পারেন না। উনি বণ্ড সই করেছেন, ডি অফ আই-এ জয়েন করেছেন। না করলেও সেই একই কাজ করতে হত, একই দায়িত্ব। তবু এই ইউনিফর্মটা কোথায় যেন কাঁটার মত বেঁধে।

বিশ্বাসঘাতক।

কথাটা মিথ্যে নয়। নীপা বলেছিল, বাবা, লোকটা আমাদের খুব বিশ্বাস করেছে।

সত্যি তাই।

সারা রাত জেগে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দেখলেন ভোর হয়ে গেছে। ইন্দ্র নীপা চারুবালা যে যেখানে বসে ছিল সেখানেই ঘুমে ঢলে পড়েছে।

ইন্দ্রর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিলেন, ইন্দ্র ওঠ, ভোর হয়েছে।

ধড়মড় করে উঠে পড়লো ইন্দ্র। ওরাও উঠলো ডাক শুনে। আর গুরুদাস ধীরে ধীরে বাগানের দিকের জানালাটা খুললেন। ওঁরা যে জেগে বসে আছেন বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাবে বলে রাত্রে জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

জানালা খুলে উঁকি দিয়ে দেখলেন গুরুদাস। না, কেউ কোথাও নেই। প্লাটফর্ম নির্জন।

আর তখনই নীপা বলে উঠলো, মা সব্বনাশ হয়েছে। পার্বতিয়ার থালা গ্লাস তো ঐ ঘরে, ও তো এসেই খোঁজ করবে। ওকে গেলাসে চা দিতে হবে।

গুরুদাসও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একথা রাত্রে একবারও ভাবা হয় নি।

চারুবালা বললেন, পার্বতিয়া যদি ওকে দেখতে পায়···

চারুবালার ভয় লোকটার জন্যে নয়। ভয় পার্বতিয়াকেই। ও যদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ওঘরে তালা কেন, কিছু একটা বললেই চলবে। কিন্তু লোকটা যদি ওর সামনেই ডাকাডাকি করে বসে, কিংবা পার্বতিয়া যদি দেখতে পায়, মাস্টারবাবুর কোঠিতে এক সাহেব আদমি রাত কাটিয়েছে। ছি ছি।

ইন্দ্র বললে, লোকটা খারাপ নয়। বরং তালা খুলে ওগুলো বের করে নিই।

চারুবালা বললেন, রাত্রেই যে পালাতে চায় নি, দিনের বেলা সে কি আর পালাবে?

শুধু গুরুদাস বললেন, পালাবে না, কিন্তু খুব রেগে আছে নিশ্চয়। বুঝতেও তো পেরেছে তালাচাবি দিয়ে রেখেছি।

ইন্দ্র এসে নিঃশব্দে তালাটা খুললো। চারুবালা কাছে এসে দাঁড়ালেন। তেমন কিছু হলে, ছেলেকে বাঁচাবেন।

যে পালাতে সাহস পাবে না, সে রেগে গিয়ে কিছু ছুঁড়ে মারতে পারে।

একটাই ভরসা পিস্তলটিস্তল নেই।

দরজাটা খোলা হল। নিঃশব্দে।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রর মুখে হাসি দেখা দিল। ইশারায় ডাকলো সবাইকে।

আশ্চর্য। এই লোকটারই জীবন নিয়ে টানাটানি। অথচ নির্ভাবনায় ঘুমোচ্ছে। ঐ মেঝেতে শুয়ে।

নীপা এসে দেখলো। একপাশে ইন্দ্রর তক্তপোশ রয়েছে, তার ওপর বিছানা বালিশ গুটিয়ে রাখা। অথচ সেগুলো পেতে নেয় নি।

পায়ের শব্দ না করে একে একে থালা গ্লাস জলের মগ সব বের করে নিয়ে আবার তালা লাগানো হল।

কিন্তু ওর ঘুমন্ত চেহারার ছবিটা কেউ চোখ থেকে মুছে ফেলতে পারলো না। কি নির্ভাবনায় ঘুমোচ্ছে।

শুধু নীপা বললে, দাদা, লোকটা বোধহয় ভেবেছে ওকে লুকিয়ে রাখার জন্যেই তালা দিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস করেছে।

বলে হাসলো নীপা।

আর সেই কথাটা মনে পড়তেই গুরুদাসের মনে হল কে যেন কানের কাছে বলে উঠছে, বিশ্বাসঘাতক!

গুরুদাস ভাবলেন বকশিকে এখন সমস্ত ঘটনাটা বললে সেও হয়তো বলে উঠবে, বিশ্বাসঘাতক।

কিন্তু গুরুদাসের তো কোন উপায় নেই। কেউ বিশ্বাস করেছে বলেই কি তার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে হবে? ও তো আইনের চোখে একটা ক্রিমিনাল। কিংবা তার চেয়েও বেশি। ওকে ধরিয়ে না দিলে গুরুদাস নিজেই একজন ক্রিমিনাল হয়ে যাবেন। তার চেয়েও বেশি। এটা ওয়ার-টাইম। উনি নিজেও একজন লান্স নায়েক। হোক না আই ই। লোকটা একজন পলাতক যুদ্ধবন্দী। এর কোন ক্ষমা নেই।

ওকে প্রোটেকশন দিলে এই ইউনিফর্মটাও তো বলবে, বিশ্বাস-ঘাতক। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও।

অন্যদিন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভোরের প্রকৃতিকে দেখেন। বড় ভাল লাগে। পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য উঠে শাল গাছের মাথায় আটকে থাকে। নরম রোদ্দুরের তির্যক বর্শার ফলা শাল মহুয়ার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ে এখানে ওখানে। রোদ্দুরের ঝর্নার পাশাপাশি শাল গাছের ছায়া পড়ে লম্বা হয়ে। আঁকা ছবির মতই লাগে।

আজ আর গুরুদাসের ওসব প্রাকৃতিক শোভা দেখতে ভাল লাগলো না। এখন বুকের মধ্যে একটা উদ্বেগ। কখন হুইটলি কিংবা অন্য কেউ আসবে ঐ পলাতক বন্দীটার খোঁজে। কিংবা শুধুই ওঁদের কাছে জিজ্ঞেস করতে, দেখেছেন কিনা।

নিজের অফিস ঘরের দিকে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন গুরুদাস।

প্লাটফর্মের ও প্রান্ত থেকে গানের সুর ভেসে আসছে।

প্রতিদিনের মতই রেজার দল চলেছে ঠিকাদারের কুঠিতে। দল বেঁধে দেহাতি আদিবাসী মেয়েরা দূরের মুণ্ডাধাওড়া থেকে প্রতিদিন এ-সময় কাজ করতে যায়। রেল লাইন টপকে টপকে এসে প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়।

হাঁটা নয়, যেন নাচের ছন্দে চলা। কোমর জড়াজড়ি করে এক এক সারিতে দশ পনেরো জন মেয়ে, গান গাইতে গাইতে মনের আনন্দে, একটানা সুরের গান, তারই ফাঁকে ফাঁকে হাসাহাসি, ঢলাঢলি, পথে দেখা কাউকে নিয়ে চোখের ইশারায় রসিকতা নিজেদের মধ্যে, তারপর আবার গান।

দেখতে বড় ভাল লাগে। এই পরিবেশের সঙ্গে ওরা স্বচ্ছন্দে মিশে আছে। শালফুলের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে, মহুয়া ফুলের মাতাল হাওয়ায়। কিন্তু অল্পে তুষ্ট মেয়েগুলো বড় বোকা। জানে না ঐসব রঙ্গরসিকতায় ওরা পুরুষের মনে লোভ জাগিয়ে দেয়। বিশেষ করে এই মিলিটারি অফিসারদের মনে।

দূর বিদেশে স্ত্রীকে ফেলে রেখে মিলিটারি ক্যাম্পে ক্যাম্পে কাটাতে হয় বলেই কি বেলেল্লাপনা করতে হবে! গুরুদাসও তো প্রথম বয়সে সংসার ছেড়ে স্টেশনে স্টেশনে কাটিয়েছেন। কই কোনদিন তো পদস্খলন হয় নি। আর এই অফিসার আর টমির দল! নিত্যদিন পার্টি লেগেই আছে। রঙচঙে পোশাক পরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের দল, একবার এসেছিল একটা মিলিটারি নার্সের দল, কখনো বা ডবলু এ সির সেই নীলপরীরা। দামী দামী রঙিন গাউন পরে নাচতে যায়। কখনো ইউনিফর্ম পরেই জীপে কিংবা মিলিটারি ট্রাকে সোলজারদের মাঝখানে বসে বল্লাহীন উল্লাস, শরীরের অট্টহাস।

সে-সব তবু সহ্য করেন। কিন্তু এই কালোকুলো মেয়েগুলোকে কখনো সখনো ওদের সঙ্গে দেখলে ওঁর সারা শরীর জ্বলে ওঠে। গুরুদাস জানেন, উনি নিজেও ওদের তাচ্ছিল্য করেন, হয়তো ঘৃণাও,

চারুবালা তো পার্বতিয়াকে অস্পৃশ্য ভাবেন, তবু ঐ ব্রিটিশ বা আমেরিকান সৈন্যদের সঙ্গে কোন কালোকুলো মেয়েকে দেখলেই ভীষণ অপমানিত লাগে। যেন এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আর হয় না। তখনই বুঝতে পারেন ওরা আমাদেরই লোক। আমরাই।

লেফটেনেণ্ট কর্নেল হামফ্রের কথা মনে পড়লো। একেবারে ওপর তলার আমেরিকান অফিসার। ইয়াঙ্কি স্বরে কথা বলতো। ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যেই বোধহয় এখানে ছিল। মাঝে মাঝে রাঁচি যেত, ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের হেডকোয়ার্টার।

খুব মিশুকে ছিল লোকটা। ব্রিটিশ অফিসারদের মত রাশভারি নয়

এমনি একটা কুলিকামিনের দল গান গাইতে গাইতে চলেছে কোমর জড়াজড়ি করে, হেলেদুলে, হাসতে হাসতে।

হামফ্রে হঠাৎ একজনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, ব্ল্যাক গডেস।

তারপর কোনদিন 'চার্মিং', কোনদিন ঠাট্টার সুরে হোয়েস´ মাই গার্ল ফ্রেণ্ড।

হঠাৎ একদিন শনিচারীর হাটের দিকে যাচ্ছেন, পীচ রাস্তা পার হবেন, একটা জীপে সেই ব্ল্যাক গডেসকে দেখলেন, হামফ্রের পাশে। মনে হল মদ খেয়েছে, ঢলে ঢলে পড়ছে, কি কুৎসিত হাসি।

অবশ্য ঐ একটাই ব্যতিক্রম। এখানে। তারপর থেকে মেয়েটাকে আর রেজার দলে দেখা যেত না। ওরাও আর মিলিটারিদের নিয়ে হাসাহাসি করতো না। যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

ব্ল্যাক গডেস। কালো প্রতিমা।

হ্যাঁ, সেই মেয়েটাই অবাক করে দিল।

একজন পাঞ্জাবী শিখ, সন্তোক সিং, একটা বিরাট ঝকঝকে দোকান খুললো ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে। মিলিটারির লোকদের জন্যে।

এক পাশে মদের বার, আরেক দিকে নানান জিনিসপত্র, মেম সাহেবদের দামী দামী গাউন থেকে টুকিটাকি নানান জিনিস সোলজাররাই কিনতো, বোধহয় যারা নাচতে আসতো তাদের উপহা

দেবার জন্যে। তখন চতুর্দিকে টাকা উড়ছে। রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাচ্ছে অনেকে। আর অন্য সকলে গরীব হয়ে যাচ্ছে. জিনিসের দাম বাড়ছে চচ্চড় করে, চালের দাম।

গুরুদাসদের অবশ্য ঐসব ভাবনা নেই। চাল চিনি এগপাউডার, আরো কত কি। অঢেল সস্তার র‍্যাশন। কোথাও চিনি পাওয়া যায় না, ডাক্তার হাজরা এখনো আসেন টাঙ্গায় করে. কৌটো ভর্তি চিনি নিয়ে যান, রেলের সস্তা দরের চিনি।

ঠিকাদার লাহিড়িকেই শুধু দেওয়া বন্ধ করেছেন। রাগে, অভিমানে। লাহিড়ি ভেবেছিল উনি লাভ করছেন। বিদেশ বিভূঁই, বাঙালীকে একটু সাহায্য করা। তাও পারলেন না। কি ছোট মন। অথচ বাজপেয়ীজী কথায় কথায় কৃতজ্ঞতা জানান, দুবার মাত্র গম দিয়েছিলেন বলে।

আর ঐ সন্তোক সিং। মদের দোকান করলেও কি অমায়িক ব্যবহার। প্রায়ই যেতে বলতো তার দোকানে।

গুরুদাস আর বকশি নেহাৎ ভদ্রতার খাতিরেই গিয়েছিলেন। দুপুরবেলা, একেবারে জনশূন্য।

হঠাৎ সেই সময়ে শাড়ি পরা সেই ব্ল্যাক গডেস মেয়েটা এসে ঢুকলো, একাই। সেলসম্যানরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল ওকে দেখে। দেখে বোঝা গেল ওরা কেউই মেয়েটাকে চেনে না।

তখনই একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেল।

দেয়ালে কয়েকটা রংবেরংয়ের সুন্দর সুন্দর গাউন ঝুলছিল।

মেয়েটা কেমন লোভী চোখে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা গাউনের দাম জিজ্ঞেস করলো।

সেলসম্যান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললে, বহুৎ রুপেয়া।

কালোকুলো মেয়েটা তবু জিজ্ঞেস করলো কত দাম।

—সাতশো।

সঙ্গে সঙ্গে শাড়ির কোঁচড় থেকে এক তাড়া নোট বের করে দিল সে।

গাউনের প্যাকেটটা নিয়ে সদর্পে সকলকে তুচ্ছ করে চলে গে
মেয়েটা।

আর গুরুদাসের নিজেকে বড় ছোট মনে হল। ওঁর হঠাৎ মনে হল যেন সমস্ত দেশটা ধর্ষিতার গর্ব নিয়ে সদর্পে পা ফেলে চলেছে কোথায় কে জানে।

কালোকুলো মেয়েগুলো কোমর জড়াজড়ি করে গান গাইতে গাইতে তখন প্লাটফর্ম পার হয়ে চলে গেছে।

গুরুদাস এসে বসলেন নিজের অফিস ঘরে। রতনমণি আগেই এসেছেন, টেলিগ্রাফ যন্ত্রটার সামনে বসে আছেন।

ওঁর দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন, শরীর খারাপ নাকি গুরুদাসদা

গুরুদাস চমকে উঠেই তাড়াতাড়ি বললেন, না না, শরীর খারাপ হবে কেন! ভিতরে ভিতরে কিন্তু বিব্রত বোধ করলেন। তা হলে কি ওঁর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ওঁর ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে।

জার্মান সিলভারের কৌটো থেকে পান বের করলেন রতনমণি।

তারপর চাপা গলায় বললেন, কাল রাত্রের ব্যাপারটা শুনলাম।

গুরুদাসের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠলো। কোন কথা বলতে পারলেন না।

আর রতনমণি থেমে থেমে বললেন, ঐ যে পিয়ারীলাল ডিম সাপ্লাই দেয় পি ও ডবলু ক্যাম্পে, ও বলছিল···

—কি, কি বলছিল?

কৌটো থেকে পান নিয়ে কটাস করে ডিবেটা বন্ধ করলেন। ক্ষুদে মাপের অগুন্তি সাজা পানে ঠাসা থাকে ওটা। দিবারাত্র পান চিবোচ্ছেন। সামনের একটা দাঁত উঁচু, পোকায় খাওয়া। ঠোঁটে ঠোঁট চাপলেও সেটা বেরিয়ে থাকে পানের ছোপ লেগে লাল হয়ে।

রতনমণি বললেন, পিয়ারীলাল এখান দিয়েই গেল একটু আগে।

গুরুদাসের প্রশ্ন করতেও ভয়।

রতনমণি চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিলেন গুরুদাসের মুখোমুখি। বললেন,

ঐ যে সন্ধ্যেবেলায় আলো নিভে গেল, গুলির শব্দ হল …ক'টা মরলো কে জানে।

গুরুদাস তাকিয়ে রইলেন রতনমণির দিকে। যাক, ওঁর বাড়ির ব্যাপারটা নয়। ওদিক থেকে নিশ্চিন্ত। কিন্তু জানার আগ্রহ একদিকে, কি হয়েছিল কাল, ঐ পি ও ডবলু ক্যাম্পে ? অন্যদিকে প্রসঙ্গ বদলাতে পারলেই যেন ভাল।

হুইটলিকে বলার পর যখন জানতে পারবে, তখন রতনমণি তো বলে বসতে পারেন, এত কথা হল কালকের ইনসিডেন্ট নিয়ে, আর একবারও বললেন না, আপনার বাড়িতেই…

এ এক যন্ত্রণা।

রতনমণি নিজের মনেই বলে চললেন, কানাঘুষো শুনে এসেছে পিয়ারীলাল, দুটো প্রিজনারকে নাকি লাশ বানিয়ে দিয়েছে।

—কেন ? কেন ? গুরুদাস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

তারবাবু রতনমণির কান সজাগ থাকে গল্প করার সময়েও। টেলিগ্রাফ যন্ত্রটায় টরে টক্কা টরে টক্কা আওয়াজ উঠলো। শুনলেন। না, ওঁর মেসেজ নয়।

বললেন, ঐ যা বলে আর কি ওরা। আসলে গুলি করে মারে, তারপর বলে জাল কেটে পালাতে যাচ্ছিল। অবশ্য সত্যি সত্যি পালাবার চেষ্টাও করতে পারে। হাজার হোক সাহেবের রক্ত, বুঝলেন না।

গুরুদাস একদিকে নিশ্চিন্ত হলেন, অন্যদিকে দুর্ভাবনা। মিলিটারির কেউ আসছে না কেন। হুইটলি কিংবা বেল। অথবা আর কেউ। এ-সময়ে আসে না ঠিকই। কিন্তু আজ তো ব্যতিক্রম হবার কথা। বলছে, দুজন প্রিজনার গুলি খেয়ে রক্তমাখা লাশ হয়ে গেছে। তা হলে বোধহয় কয়েকজন মিলে দল বেঁধেই পালাচ্ছিল। দুজন মরেছে। দুজন না কি আরো বেশি, কে জানে। কিন্তু পালিয়েছে ক'জন ? একটা তো ওঁরই কোয়ার্টারে। তালাচাবি দিয়ে বন্দী করে রাখা আছে।

এখনই কেউ এলেই তো ধরিয়ে দেবেন। তা হলে কি ঐ লোকটাও ডেড বডি হয়ে যাবে, কোন সোলজারের গুলিতে? তা কেন হবে? ওসব মিথ্যে রটনা।

গুরুদাস অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। মেজর হুইটলিকে কিংবা ক্যাপ্টেন বেলকে বলে ফেললেই উনি মুক্ত। প্রিজনার পালিয়েছে অথচ ওদের যেন খুঁজে বের করার কোন চেষ্টাই নেই। এতক্ষণে তো এসে জিজ্ঞেস করার কথা।

রতনমণি বললেন, কাউকে বলবেন না যেন। পিয়ারীলাল বলছিল, টমি ব্যাটারা কেউ কিছু বলে নি। শুধু বলেছে ইলেকট্রিকে কোথায় শর্ট শার্কিট হয়ে আলো নিভে গিয়েছিল।

গুরুদাসের তখন আর ওসব জানার কোন আগ্রহ নেই। উনি ক্যাম্পের দিকে পীচ রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোন জীপ বা ট্রাক আসছে কিনা।

সকালে পার্বতিয়া যখন বাসন মাজতে এলো কি অস্বস্তি। হঠাৎ না বারান্দার দিকে চলে আসে। হঠাৎ না প্রশ্ন করে বসে, দাদাবাবুর দরোজায় তালা কেন।

ওটা ইন্দ্রর ঘর। ওখানেই শোয়।

পার্বতিয়া এসে যেই শুনলো রাতের ভাত রুটি ডাল তরকারি কিছু পড়ে নেই, চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

গুরুদাসের তখন ভয়, ওর চিৎকার শুনে ঘরের ভিতর থেকে প্রিজনারটা না কথা বলে ওঠে। কিংবা হয়তো দরজায় টোকা দিয়ে বসলো।

পার্বতিয়া রাগ করে চা খেল না। বাসনকোসন মেজে দিয়ে চলে গেল। গজগজ করতে করতে বলে গেল, বাচ্চা ভুখা মরবে, আর ও কিনা চা খাবে।

আসলে ঐ বাড়তি পাওনা এখন ওর দাবী হয়ে গেছে। উদ্বৃত্ত খাবার ফেলে দেয়ার বদলে ওঁরা নিজেরাই ওকে দেবার কথা ভেবেছিলেন। ভাবতেন দয়া করে দিচ্ছেন।

না, ওটা দয়া নয়। এক ধরনের ঘুষ। খুশি রাখার চেষ্টা। এখানে বাসন মাজার লোক পাওয়া খুব কঠিন। মেয়েরা সবাই তো রেজার কাজ করে। কেউ বা অন্য কিছু। কিন্তু বাসন মাজতে রাজি নয়। ওঁর স্টেশনের খালাসিরা সব কাজ করে দেবে, কিন্তু এঁটো বাসনে হাত দেবে না, মেয়েদের কাপড় কাচবে না।

এ এক অদ্ভুত গোলকধাঁধা। একজন আরেকজনের কাছে অস্পৃশ্য। চারুবালার কাছে সাহেবরাও। খালাসিদের কাছে আমরা। একটা ঘৃণার বৃত্তে সমস্ত মানুষ ঘুরছে। তোমাকে কেউ যদি ঘৃণা করে, তুমি আরেকজনকে ঘৃণা করো।

সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ড দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, ড্যামন ফ্যাসিস্টস।

জার্মান-ইটালিয়ানরাও হয়তো ইংরেজদের আমেরিকানদের ঐ রকমই কিছু বলে।

আগেকার দিনেও বোধহয় এমনিই ছিল। শত্রু হলেই তাকে অসুর বলতো, রাক্ষস বলতো। গায়ে একটা ছাপ মেরে দাও, ব্যস, লোকটাকে আর মানুষ মনে হবে না।

নীপা আর ইন্দ্র কি যেন আলোচনা করছিল, পার্বতিয়া রেগে চলে যাবার পর।

নীপা বললে যুদ্ধ তো একটা যন্ত্র, তার মধ্যে পড়ে গেলে মানুষও যন্ত্র হয়ে যায়।

ইন্দ্র বললে, সমাজ, কিংবা রাষ্ট্র, সেও তো যন্ত্র। এই বিদেশী শাসন।

নীপা বলেছিল, ঠিকই তো। আমরা কি ঐ প্রিজনারটাকে ভয় পাচ্ছি, না বিদেশী শাসনকে? একটা মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সাহসও আমাদের নেই।

ইন্দ্র হেসে বললে, বীরত্ব মানে কি জানিস, নিজের দেশের লোকের হাতে গুলি খেয়ে মরার ভয়ে অন্য দেশের লোককে গুলি করে মারা।

কথাগুলো গুরুদাস শুনছিলেন, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। এরা এমন সব কথা বলে যা গুরুদাস কোনদিন ভাবেন নি।

ঠিক তখনই কোণের ঘরের দরজায় টোকা পড়লো।

—খুলবো? ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলো। বললে, রাত্রেই যে পালায় নি, সে কি এখন আর পালাবে।

নীপা হেসে বললে, এক কাপ চা দেবো ওকে? চারুবালার দিকে তাকিয়ে বললে, দেবো মা?

চারুবালা কোন উত্তরই দিলেন না।

তালা খুলে কপাট ঠেলতেই লোকটা সৌজন্যের হাসি হাসলো— বুয়েনো সেরা, বুয়েনো সেরা, বুয়েনো সেরা।

একবার করে এক একজনের দিকে তাকায় আর হাসতে হাসতে বলছে, বুয়েনো সেরা।

লোকটা জানেও না ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে সকলেই ওরা দেখে গেছে।

ও নমস্কার করার চেষ্টা করলো। নিষ্পাপ সরল কৃতজ্ঞতার হাসি।

নীপা হেসে উঠে বললে, ওরকম নয়। ওরকম নয়। এই ছাখো। বলে নমস্কারের ভঙ্গিটা দেখালো। লোকটা ওকে অনুকরণ করার চেষ্টা করলো। হাসতে হাসতে বললে, গ্রাৎজি।

নীপা হেসে বললে, যা খুশি তুমি বলে যাও খোকা, আমরা কিছুই বুঝছি না।

লোকটা কিছু মনে করতে পারে, তাই ইন্দ্র হাসি চাপলো।

নীপা বললে, কি সাহেব চা খাবে নাকি।

লোকটা কিছুই বুঝলো না। শুধু চোখে মুখে কেমন একটা কৃতজ্ঞতা এনে গুরুদাসের হাতটা মুঠো করে ধরলে। ইন্দ্রর হাত।

তারপর চারুবালার দিকেও এগিয়ে যাচ্ছিল হয়তো। চারুবালা চমকে উঠে অস্বস্তিতে পিছিয়ে গেলেন।—নীপা সরে আয়।

লোকটা বোকার মত তাকালো। বোধহয় বুঝলো কিছু। আর নীপা ফিসফিস করে বললে, একেবারে রাজপুত্তুর, না রে দাদা? মা

ছাখো, কি সুন্দর দেখতে, রাত্রে অতটা বোঝা যায় নি। একেবারে ছেলেমানুষ।

চারুবালা বলে উঠলেন, দুধের ছেলে। কোন দেশ, ওরা কি মানুষ রে, এই বয়েসের ছেলেকে যুদ্ধে পাঠায়।

ইন্দ্র হাসছিল। ছেলেমানুষ, দুধের ছেলে! অথচ ওরই সমবয়সী বোধহয়! মুখখানা সরল নিষ্পাপ শিশুর মত।

—বাবা, তুমি ঠিকই বলতে। দেবশিশু।

কথাগুলো গুরুদাসকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করছিল। এসব তো মায়া-মমতার কথা। ওঁর সামনে এখন প্রচণ্ড বিপদ। বাঁচতে হবে। এ যেন ঠিক ঐ রণক্ষেত্রের মতই। জীবনটাও হয়তো তাই। নিজেকে বাঁচাতে হলে ওর বাঁচা চলবে না। ওকে বাঁচাতে গেলে নিজে বাঁচা যাবে না। যেন একদল সোলজার বেয়নেট উঁচিয়ে ট্রেঞ্চ দখল করতে চলেছে। তুমি থেমে পড়লে, ফিরে দাঁড়াতে গেলে, পিছনের লোকই তোমাকে গুলি করে মারবে। সামনের শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মারতে পারলেই তুমি বাঁচবে। না মারতে পারলে তুমিই শেষ হয়ে যাবে।

দেবশিশু। নিজেই বলেছেন একসময়। এখন আর শুনতেও ভাল লাগছে না।

ভিতরে ভিতরে অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন ঐসব কথা মনে পড়তেই। কই, কেউই তো আসছে না, খোঁজ করছে না। মেজর হুইটলি কিংবা ক্যাপ্টেন বেল-এর দেখা নেই।

বকশিও কখন এসে ওঁর অফিস ঘরের কাগজপত্র ছড়ানো প্রকাণ্ড টেবিলের একপ্রান্তে বসেছে। উনি বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলেন।

নিজের মনেই বলে উঠলেন, কি যে করা যায়!

বকশি হেসে উঠে বললে, কি এত ভাবছেন গুরুদাসদা? মেয়ের বিয়ে?

রতনমণিও হেসে উঠলো টরে টক্কা থামিয়ে।

গুরুদাস অস্বস্তিতে বললেন, কিছু না, কিছু না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিমর্ষ মুখ নিয়ে আবার স্টেশনে ফিরে এলেন গুরুদাস। যতই দেরী হয়ে যাচ্ছে চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। কি দুর্ভাবনা। শুধু নিজের কথা ভাবছেন না। ইন্দ্র নীপা চারুবালা, একটা গোটা সংসার। কাল বিকেলেও কত সুখী ওঁরা। গুরুদাসের ওপরই তো সংসারটা নির্ভর করে আছে।

যত দেরী হচ্ছে ততই অপরাধ বাড়ছে। বিশ্বাস করানো কঠিন হবে।

মুখে হাল্কা ভাব আনার চেষ্টা করে গুরুদাস পি ও ডবলু ক্যাম্পের সামনে দিয়ে যে মেটাল রোড চলে গেছে ব্রিটিশ ক্যান্টনমেণ্টের দিকে, সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, আচ্ছা বকশি, আমরাও তো মিলিটারি···

বকশি নিজের খাকি ইউনিফর্মের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। —আলবৎ মিলিটারি।

গুরুদাস বললেন, আমরা যদি, মানে আমি, যদি ঐ ব্রিটিশ ক্যাম্পের ওদিকে যাই···

কথা শেষ করার আগেই বকশি বললে, তা হলে জেনে রাখুন এস এমের পোস্ট খালি হয়ে যাবে। বলে হাসলো। বললে, আর্মড গার্ড সারা এলাকায়, চেঁচিয়ে কি বলবে আপনি বুঝতেও পারবেন না, তোৎলামি করবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বুলেট এসে···

বকশি হো হো করে হেসে উঠলো।—যাওয়ার দরকার কি গুরুদাসদা। ও শালাদের কোন বিশ্বাস আছে।

বকশি আরো কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তারবাবু রতনমণি বলে উঠলেন, পাঁচটা আটাশ, মিলিটারি স্পেশাল।

গুরুদাস নিশ্চিন্ত হলেন। যাক, তা হলে ঐ সময়ে অন্তত মেজর হুইটলি তার সোনালী গোঁফ নাচাতে নাচাতে এসে হাজির হবে। ক্যাপ্টেন বেলও।

কিন্তু গুরুদাস অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। ক্রমশ দেরী হয়ে যাচ্ছে। যত দেরী হচ্ছে ততই দুশ্চিন্তা।

আর ওরাই বা সমস্ত ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছে কেন। রাত্রে না হোক, সকালেই তো ওদের এসে পড়ার কথা। বাড়ি বাড়ি সার্চ না করুক, ওঁদের তো এসে জিজ্ঞেস করবে, কোন প্রিজনারকে পালাতে দেখেছে কিনা। কিংবা বলবে, যদি দেখতে পাও, সঙ্গে সঙ্গে যেন ক্যাম্পে খবর দিও।

দেখেশুনে মনে হচ্ছে ওদের কোন চেষ্টাই নেই তাকে ধরার। আসলে একজনও প্রিজনার পালিয়েছে এই খবরটা হয়তো জানাতে চায় না। হয়তো গোপন রাখতে চায়। এত পাহারা, এত টহলদারি সত্ত্বেও কেউ পালিয়েছে, সেটা বোধহয় ওদের কাছে চরম অপমান। কিংবা নেটিভ ইণ্ডিয়ানদের কাছে সে-কথা বলতেও লজ্জা।

কিন্তু গুরুদাস কোন রকমে খবরটা ওদের জানিয়ে দিতে পারলেই ওঁর বুকের ওপর থেকে ভারি পাথরটা সরে যেত।

এ এক অসহ্য কষ্ট।

চাপা দুর্ভাবনার ফলে ওঁর কাছে সবই বিরক্তিকর লাগছিল।

ব্যানার্জিবাবু তারস্বরে টেলিফোন করছেন সোনডিমরা স্টেশনে। চিৎকার করে না বললে শুনতে পায় না। এ এস এম যখন কেবিন-ম্যানকে নির্দেশ দেয়, তখনও এমনি চিৎকার করে বলতে হয়। দিনরাত ট্রেনের আওয়াজ, গুডস ট্রেনের শান্টিংয়ের ঠং ঠঙা ঠং, ইঞ্জিনের হুইসল, কিংবা প্যাসেঞ্জারদের হট্টগোলে সব চাপা পড়ে যায়। সবই জানেন গুরুদাস, তবু ব্যানার্জিবাবুর চিৎকারে বিরক্ত হচ্ছিলেন।

মায়েল গোলারোড সোনডিমরা বারলাঙ্গা মুরী।

রতনমণি বললেন, মুরী ছেড়েছে।

ব্যানার্জিবাবু তখনো চিৎকার করে চলেছেন।

একদিন ক্যাপ্টেন বেল-এর সামনেই এভাবে তারস্বরে ফোন করছিলেন গুরুদাস।

ক্যাপ্টেন বেল ঠাট্টা করে বলেছিল, ইউ নীড নো গ্যাজেটস, যা চিৎকার করছো এমনিতেই শুনতে পাবে।

খুব লজ্জা পেয়েছিলেন গুরুদাস। ওরা কি বুঝবে কতখানি হট্ট-গোলের মধ্যে কাজ করতে হয়। হট্টগোল এখানে না থাকলেও ও প্রান্তে আছে।

অপেক্ষা করতে করতে কখন পাঁচটা বেজে গেছে। পাঁচটা আটাশে মিলিটারি স্পেশাল। অথচ বেল বা হুইটলির দেখা নেই।

রতনমণি টরে টক্কা টরে টক্কা করতে করতে বললে, মায়েল ছাড়লো।

আর মাত্র কয়েক মিনিট।

গুরুদাস দেখলেন চার চারটে অতিকায় মিলিটারি ট্রাক সেই পি ও ডবলু ক্যাম্পের খাঁচার দরজা পার হয়ে মেটাল রোড ধরে প্রচণ্ড স্পীডে আসছে, স্টেশনের দিকেই।

গুরুদাসের ভিতরটা দুরুদুরু করে উঠলো। হঠাৎ ভাবলেন, আচ্ছা, বকশিকে রতনমণিকে ব্যাপারটা বলে রাখলেই কি ভাল হত? যদি মেজর হুইটলি তার সোনালী গোঁফ নাচিয়ে প্রশ্ন করে বসে, সিক্রেট রেখেছো কেন ব্যাপারটা? হয়তো বকশিকে জিজ্ঞেস করে বসলো, তুমি দেখেছো? বকশি তো আকাশ থেকে পড়বে। আর তখন গুরুদাসকে জেরা করবে, ওদের বলোনি কেন? ক্যাম্পে খবর পাঠাওনি কেন?

ভিতরে ভিতরে ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেলেন গুরুদাস।

আমার যা হয় হোক, আমার বোকামির জন্যে ছেলেমেয়েকেও বিপদে পড়তে হবে না তো! স্ত্রীকে?

গুরুদাসের হঠাৎ মনে হল উনি ভীত সন্ত্রস্ত মুখে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা ফায়ারিং স্কোয়াড যেন গোল হয়ে ঘিরে রাইফেল উঁচিয়ে প্রস্তুত। এখনই কেউ চিৎকার করে অর্ডার দেবে, ফায়ার।

—আচ্ছা বকশি, মিলিটারির আইনে বোধহয় ক্ষমা বলে কিছু নেই, তাই না?

বকশি ওঁর কথাটার প্রসঙ্গ খুঁজে পেল না। হেসে বললে, হঠাৎ এ কথা কেন?

—না, এমনি বলছি। গুরুদাস হাসার চেষ্টা করলেন।

বকশি হয়তো আরো কিছু বলতো, তার আগেই পানিপাঁড়ে বিরজু দরজার সামনে এসে বললে, দেখিয়ে মাস্টারসাব, দেখিয়ে।

গুরুদাস তার আগেই লক্ষ্য করেছেন।

চারখানা ট্রাক এসে থেমেছে। দূরে আরো কয়েকটা আসছে।

ততক্ষণে দুটো ট্রাক থেকে রাইফেল হাতে সৈন্যের একটা দল নেমে পড়েই দৌড়তে দৌড়তে প্লাটফর্মে এলো। যেখানে ট্রেন দাঁড়াবে সেখানে তিন চার গজ অন্তর দাঁড়িয়ে পড়লো। আর ওদিকে লাইনের ওপাশে আরেক দল টমি। তারাও রাইফেল হাতে তিন চার গজ অন্তর দাঁড়িয়ে গেল। যেন পুরো ট্রেনটাকে দুদিক থেকে পাহারা দেবে।

কি ব্যাপার। মিলিটারি স্পেশালে কারা আছে? খুব উঁচুদরের অফিসাররা কি! কর্নেল, জেনারেল, ফীল্ড মার্শাল—এরাও কখনো কখনো রাঁচির ইস্টার্ণ কম্যাণ্ডের হেড কোয়ার্টারে যায়। কিন্তু সে তো প্লেনে। এখানে এলেও ক্যাম্পের ওদিকে ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডে নামে। কেউ দেখতেই পায় না। অনেক পরে কানাঘুষো শোনে, এসেছিল।

গুরুদাস চেয়ার ছেড়ে প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন। ওঁর চোখ তখন মেটাল রোডটার দিকে। মেজর হুইটলির জীপটা কখন আসে। উদগ্রীব হয়ে মনে মনে ইংরেজিতে কথাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছিলেন। কি বলবেন। মেজর, আই হ্যাভ কেপট এ প্রিজনার আণ্ডার লক অ্যাণ্ড কী।

ওদিকে ভজনলাল ঘন্টি বাজিয়ে দিয়েছে, উঁকি মেরে দেখলেন সিগন্যাল পড়ে গেছে, দূরে ইঞ্জিনের মাথায় কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। এসে পড়লো বলে।

আর ঠিক তখনই, একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, ওদিকে আরো কয়েকটা ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে, তা থেকে ইটালিয়ান ইউনিফর্ম পরা এক

দল যুদ্ধবন্দী নামলো। জনা পঞ্চাশ হবে। নিরস্ত্র অথচ ইউনিফর্ম পরা প্রিজনাররা সারি দিয়ে হেঁটে এলো, তাদের দু'পাশে রাইফেল হাতে আর্মড গার্ডের সারি।

প্লাটফর্মে উঠে এলো ওরা। আর তখনই মিলিটারি স্পেশাল ট্রেনটা এসে থামলো।

গুরুদাস দেখলেন একেবারে ফাঁকা ট্রেন।

চটপট সেই প্রিজনারদের কামরায় কামরায় তুলে দিল ওরা। তারপর চারজন চারজন করে টমি রাইফেল নিয়ে এক এক কামরায় উঠে পড়লো। দু দিকের দরজা আটকে দাঁড়ালো তারা।

আর একজন অফিসার, হ্যাঁ কাঁধে তিনটে স্টার, ক্যাপ্টেনই। সে কি অর্ডার দিতেই লাইনের দু'পাশে যারা পাহারা দিচ্ছিল, মার্চ করে ফিরে গেল। ট্রাকগুলোর দিকে।

গার্ড সবুজ পতাকা নাড়ছে।

গুরুদাসের চোখ তখন চতুর্দিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথাও মেজর হুইটলি, কিংবা ক্যাপ্টেন বেল, কিংবা চেনা কোন মিলিটারি অফিসার এসেছে কি না।

হঠাৎ দেখতে পেলেন প্রায় বিদ্যুৎগতিতে একটা জীপ এসে থামলো।

আর তা থেকে নেমেই মেজর হুইটলি এবং ক্যাপ্টেন বেল ছুটতে ছুটতে আসছে। নিশ্চিন্ত হলেন গুরুদাস।

ট্রেনটা চলে গেলেই বলবেন ওদের।

কিংবা ওরাই হয়তো এসে প্রশ্ন করবে। বলবে চতুর্দিকে একটু চোখ রাখতে। যদি কোন প্রিজনার···

কিন্তু এই জন পঞ্চাশ মাত্র ইটালিয়ান প্রিজনারকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এখন? কেন নিয়ে যাচ্ছে? তা অবশ্য জানতে পারবেন না। জিজ্ঞেস করলেই বলবে, ইণ্ডিয়ান কিউরিওসিটি। হেসে উঠবে। কিংবা ধমক দিয়ে বলবে, হ্যাটস নান অফ ইয়োর বীজনেস্।

গুরুদাস শুধু জানেন, ট্রেনটা বরকাকানা অবধি যাবে। আর সেখানে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ আগে তাকে জানানো হবে ইঞ্জিনের মুখ কোনদিকে ঘুরবে। আরিগাড়া রাঁচি রোড, কার্মাহাটের দিকে যাবে, নাকি ভুরকুণ্ডা পাতরাতু টোরি বারোয়াডি হয়ে ডাল্টনগঞ্জ ডেরি-অন-শোনের দিকে। কিন্তু শেষ অবধি কোথায় যাবে কেউ জানে না।

গুরুদাস হুইটলি আর বেলকে আসতে দেখেই ভাবলেন ঐ অচেনা ক্যাপ্টেনকে কিছু নির্দেশ দিতে এসেছে। তাই দু'পা এগিয়ে একটু অপেক্ষা করলেন। 'মেজর, লাস্ট নাইট এ প্রিজনার জাম্পড ইনটু মাই কোর্টইয়ার্ড···

গুরুদাস হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন। উনি ভাবতেই পারেন নি। হুইটলি হাত নেড়ে গার্ডকে ট্রেন ছেড়ে দেয়ার ইশারা করলো।

গার্ডের হুইসল বেজে উঠলো। গুরুদাস ঘড়িটা দেখলেন। আশ্চর্য, এদের সব কিছুই ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। একেবারে অঙ্কের মত।

কিন্তু ট্রেন নড়ে উঠতেই হুইটলি আর বেল গুরুদাসকে অবাক করে দিয়ে প্রথম ফার্স্ট ক্লাশ কামরাটাতে উঠে পড়লো। গুরুদাস এতক্ষণে বুঝলেন ঐ কম্পার্টমেণ্ট কেন খালি ছিল।

ট্রেন তখন ধীরে ধীরে স্পীড নিচ্ছে।

নিজের অগোচরেই গুরুদাসও কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, দ্রুত পায়ে। তারপর থেমে পড়লেন। নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা প্রকাণ্ড সুযোগ যেন এইমাত্র হাতছাড়া হয়ে গেল।

গুরুদাস তখন একেবারে বিভ্রান্ত, অসহায়। উদ্বেগে ভেঙে পড়া একটা বিমূঢ় মানুষ!

ছয়

এ পথে ডাইনিং কার আসে না। মুরীতে কেটে দেওয়া হয়। ওখানে একটা বড় রিফ্রেশমেণ্ট রুমও আছে। খাওয়াদাওয়া করে নিয়ে ন্যারো গেজ লাইনের ছোট ট্রেনে পাহাড় কেটে কেটে রাঁচি যেতে হয়। নাম রাঁচি এক্সপ্রেস, কিন্তু মুরী হয়ে রামগড় হয়ে চলে যায় বরকাকানা অবধি।

এদিকে তাই ডাইনিং কারের লোকজনরা আসে না। আসে শুধু দু-একজন ভেণ্ডার, রেল কোম্পানির ছাপ মারা সোডা লেমনেড জিঞ্জার বিক্রি করতে। তাদেরই একজনের হাতে রিফ্রেশমেণ্ট রুমের ম্যানেজার বন্ধু রতনমণির জন্যে তাড়া তাড়া পান কিনে পাঠান। অন্য টুকিটাকি কিছু প্রয়োজন হলে ভেণ্ডারদের বলে দিলেই চলে। কিংবা তারবাবু রতনমণি টেলিগ্রাফ যন্ত্রে মুরীকে জানান, তার কাছ থেকে মৌখিক মেসেজ চলে যায় রিফ্রেশমেণ্ট রুমের ম্যানেজারের কাছে। সবলেই পরস্পরের চেনাজানা, কেউ কেউ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে।

নীপা সকালে চা তৈরি করতে করতে বললে, মা ছাঁকনি কিনে পাঠানোর কথা বলবে না?

এখন ওসব কথা চারুবালার মাথায় নেই। এখন ঘরের মধ্যে একটা দুষমণ ওঁদের সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে।

নীপা ইন্দ্রকে বললে, ট্রেন এলে একবার গিয়ে ভেণ্ডারকে বলে আসিস।

নীপা এখানে না থাকলে এসব দিকে মা'র চোখ পড়ে না। তারের ছাঁকনিটার জাল ছিঁড়ে গেছে, মা তার ওপর এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে কাজ চালাচ্ছিল। ন্যাকড়াটাও লিকার লেগে লেগে লাল হয়ে গিয়েছিল। নীপা সেটা ফেলে দিয়ে এক টুকরো পরিষ্কার কাপড় নিয়ে এলো।

ইন্দ্র ঠাট্টা করে বললে, বুঝেছি, ইটালিয়ান সাহেবের খাতিরে।

নীপা হাসলো।

কিন্তু ওর খুব খারাপ লাগছিল লোকটার কথা ভেবে। ওরা তাকে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখেছিল সারারাত, মিলিটারির হাতে ধরিয়ে দেবে বলেই। অথচ প্রিজনারটা সে-কথা একেবারেই সন্দেহ করে নি।

গ্রাংজি কথাটা বোধহয় ধন্যবাদ ধরনের কিছু। কিন্তু বুয়েনো সেরা বুয়েনো সেরা করলো সকলকে। গুড মর্ণিংয়ের মত কিছু কিনা কে জানে।

কিন্তু চোখেমুখে কি কৃতজ্ঞতা। যেন ওকে লুকিয়ে রাখার জন্যেই তালাচাবি দিয়ে রাখা হয়েছিল। ও যেন সেকথাই ভেবেছে।

যার সর্বনাশ করতে চাইছি, সে যদি ভেবে বসে আমি তার হিতাকাঙ্ক্ষী, তার উপকার করতে চাইছি, আর তার জন্যে যদি কৃতজ্ঞতা জানায়, তখন নিজের কাছেই নিজেকে ছোট হয়ে যেতে হয়।

নীপার দুঃখ হচ্ছিল, নিজের ওপর নিজেই বিরক্ত হচ্ছিল। আমরা তো ঐ অসহায় মানুষটার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছি। নিজেদের বাঁচাবার জন্যে। অথচ উপায়ও নেই। বাবাকে বিপদ থেকে বাঁচতে হবে।

লোকটা নিজেই পালিয়ে গেলে নীপা নিশ্চিন্ত হত। নিজেদের নিরপরাধ মনে হত। তার পর, ধরা পড়লে বা গুলি খেয়ে মরলে জানতেই পারতো না। জানলেও ততখানি আফসোস হত না।

আর তো কিছুক্ষণ। বাবা গিয়েই ওদের খবর দিয়ে দেবে।

নীপা সেজন্যেই হাসতে হাসতে ইন্দ্রকে বললে, যতক্ষণ অতিথি ততক্ষণ আপ্যায়ন। বুঝলি দাদা, বলির পাঁঠাকে খাইয়ে দাইয়ে রাখে, আদর করে স্নান করায়। আমরাও তো তাই করছি।

নীপার ঠোঁটের কোণায় দুঃখের হাসিটা মিলিয়ে গেল।

পার্বতিয়া চলে যাওয়ার পর আরেক ঝামেলা পানিপাঁড়ে বিরজু। যে লোকগুলো না এলে চোখে অন্ধকার দেখেন, এখন তারাই অসহ্য

ঠেকছে চারুবালার কাছে। শিলনোড়া নিয়ে মশলা বাটছে বিরজু। ওকে তাড়াতাড়ি বিদেয় করার জন্যে নামমাত্র মশলা দিয়েছেন। ও চলে গেলে নিজেই বেটে নেবেন। ওকে এখন তাড়াতে পারলেই বাঁচেন।

বিরজু জিজ্ঞেস করলো, মাঈজী আউর কুছ কাম আছে?

—না, তুই যা।

খালাসিদের জন্যে একজোড়া কাপডিস রাখা আছে। ওরা কোন কোনদিন কিছু কাজ করে দিলে চারুবালা ডেকে চা দেন।

সেই কাপ ডিসেই চা নিয়ে নীপা দিতে গেল লোকটাকে। আরেক হাতে দু'পীস পাঁউরুটি। সেঁকে নিয়ে নীপা সকলের অলক্ষ্যে একটু মাখনও লাগিয়ে দিয়েছে। আর সেজন্যে ওর হাসিও পাচ্ছিল।

দরজা ঠেলে ঢুকতেই লোকটা যেন সম্মান জানানোর কায়দায় উঠে দাঁড়ালো।

তারপর নীপার হাতের চা টোস্ট দেখেই নীপার মুখের দিকে তাকালো। হাসলো। আবার বললে, গ্রাৎজি।

নীপা ওগুলো মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, গ্রাৎজি রিৎসি ওসব বুঝি না।

লোকটা দুটো ইটালিয়ান শব্দ ওর মুখের উচ্চারণ শুনেও বোধহয় বুঝতে পারলো।

হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে জানালো, না।

পাঁউরুটি তুলে দেখিয়ে বললে, পানা।

নীপা হেসে ফেললে। এখন বুঝতে পারছে, রাত্রে ভাত দেখে বলেছিল রিৎসি। আর রুটি হল পানা। সেটাই বোঝাতে চাইছে।

ইন্দ্র পাশেই দাঁড়িয়ে। নীপা হেসে বললে, পানা না কচুরিপানা তুমিই জানো, এখন লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে নাও। তোমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।

লোকটা ভুরু কুঁচকে কি যেন খুঁজছিল। কি যেন মনে করার চেষ্টা। মনে পড়ে যেতেই দুম করে বললে, নাইস, ইউ নাইস্। সরিসো।

নীপা লজ্জা পেয়ে অস্বস্তিতে চোখ নামিয়ে নিল। শেষ কথাটা বুঝলোও না।

লোকটা ওর লজ্জা দেখেই হেসে উঠলো কিনা কে জানে। নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বললে, আই রোবের্তো। রোবের্তো পিয়েরোনি।

তারপর একবার নীপার, একবার ইন্দ্রর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ইউ ?

—নাম জিজ্ঞেস করছে রে দাদা, বলিস না। ইন্দ্রকে নীপা সাবধান করে দিল, তারপর কৌতুকের স্বরে বললে, আমাদের নাম জেনে তোমার কি হবে সাহেব ?

রোবের্তো কথা তো বুঝছে না, শুধু নীপার হাসি দেখে নিজেও হাসলো।

টোস্ট চিবোতে চিবোতে রোবের্তো চায়ের কাপে চুমুক দিল। এমন মুখ করলো যেন বিস্বাদ ঠেকেছে।

মাথা নেড়ে বোঝালো, ভাল না।

নীপা অখুশি আহত মুখে ঠাট্টার স্বরে বললে, চাহ্ ! পেয়েছিস এই বেশি।

রোবের্তো চায়ের কাপটার দিকে আঙুল দেখিয়ে চোখে প্রশ্ন এনে বললে, কাপি ?

—ওরে কফি ভেবেছে। চা চেনে না। নীপা হেসে উঠলো কৌতুকে। বললে, চা খেয়েছিস কখনো হনুমান ?

ইন্দ্র বেরিয়ে এসে দরজার বাইরে মাকে দেখে বললে, এতক্ষণ সুন্দর সুন্দর বলে এসে, ছাখো তোমার মেয়ের কাণ্ড, বলছে হনুমান।

চারুবালাও হাসলেন। সরে এলেন।

নীপা অসন্তোষ মুখে তাকালো, হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা ফেরত নিতে চাইলো।

ওর চোখের দৃষ্টি, কোঁচকানো ভুরু, চিবুকের বিরক্তি দেখে রোবের্তো বোধহয় অনুমান করলো, অন্যায় হয়েছে।

মাথা নেড়ে জানালো ফেরত দেবে না। মৃদু হেসে চুমুক দিয়ে দিয়ে চা-টা নিঃশেষ করলো।

কাপটা নামিয়ে রেখে কপাটের ওদিকে চারুবালাকে দেখতে পেয়ে দু'পা এগিয়ে আবার সেই নমস্কার। বললে, অনোরাতা। অনোরাতা।

—কি বলছে রে? চারুবালা প্রশ্ন করলেন।

ইন্দ্র নিজেও বোঝেনি। জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট ইজ অনোরাতা।

রোবের্তো বোকার মত হাসলে শুধু।

ইন্দ্র আর নীপা যেই বেরিয়ে আসার জন্যে ফিরে দাঁড়ালো, রোবের্তো এসে কপাটে হাত দিয়ে বললে, পোর্তা।

বলে নিজেই ইশারায় বন্ধ করতে বললে।

দরজায় আবার তালা লাগালেও ইন্দ্র আর নীপা দুজনেরই মন খারাপ হয়ে গেল। লোকটা কি বিশ্বাস করে বসে আছে। ভাবছে, আমরা ওকে লুকিয়ে রেখেছি, ওকে বাঁচাতে চাই। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা।

ইন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। কোন কথা বলতে পারছিল না। ছেলেবেলার একটা কথা ওর মনে পড়ে গেছে।

ধীরে ধীরে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বললে, মা স্কুলে পড়ার সময় আমি একবার মাংস খাওয়া ছেড়েছিলাম মনে আছে?

চারুবালা ইন্দ্রর মুখের দিকে তাকালেন।—সে আর মনে থাকবে না! কি ভয় যে পেতাম। সবাই বলতো সন্নেসী হয়ে যাবে ছেলে। কত চেষ্টা করে আবার মাংস ধরিয়েছিলাম।

ইন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।—তোমাদের কখনো বলিনি।

একটু থেমে বললে, তখন আমরা চক্রধরপুরে। তুমি মাংস কিনতে পাঠাতে। দোকানটায় খদ্দেরের সামনেই পাঁঠা কাটতো। একটার পর একটা কাটছে, আর গোটাকয়েক তার পাশেই বাঁধা আছে। ফ্যাল-ফ্যাল করে দেখছে।

একটু চুপ করে রইলো ইন্দ্র। যেন দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

—তোর পাগলামির কি আর শেষ আছে? নীপা বলে উঠলো।

ইন্দ্র বললে, পাগলামি নয়। জানো মা, যেই কাটা ছাগলটা সরিয়ে নিয়ে গেল, দেখি কি, পিছনে দড়িতে বাঁধা আরেকটা ছাগল গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে, নিজের থেকেই।

সঙ্গে সঙ্গে নীপা চেঁচিয়ে উঠলো, আঃ দাদা, বলিস না, বলিস না। দু হাতে চোখ ঢাকলো নীপা, যেন দৃশ্যটা ওর সামনেই ঘটছে।

চারুবালা বিশ্বাস করলেন না।—দূর তাই কখনো হয়। তোর মনে হয়েছে।

আর ইন্দ্র বললে, ঐ রোবের্তো, তোমার ছেলে গো…

ঠাট্টার স্বর হঠাৎ গাঢ় হয়ে গেল। ইন্দ্র বললে, রোবের্তো নিজেই দরজায় তালা লাগাতে বললো দেখে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল।

সবাই চুপচাপ। কেউ কথা বললো না। ছেলেবেলার একটা তুচ্ছ ঘটনা, হঠাৎ যেন একটা বিরাট তত্ত্বকথা হয়ে ওদের অভিভূত স্তব্ধ করে দিয়েছে।

সারাটা দিন বাড়ির কাজকর্ম করেছেন চারুবালা, কিন্তু মুখ দেখে মনে হয়েছে অন্যমনস্ক।

ইন্দ্র আর নীপা প্রতি মুহূর্তেই ভেবেছে, মিলিটারি পুলিস চলে আসবে। কিংবা হুইটলি বা বেল। ওদের দূর থেকে দেখেছে, চেনে। বেল-এর ফেল্ট হ্যাটে স্টার, কাঁধের স্ট্র্যাপেও তিনটে করে। হুইটলির একটা ক্ষুদে মুকুট, আর মজার দেখতে সোনালী গোঁফ।

এক একবার নীপা জানালায় উঁকি দিয়ে গেছে। বাইরে একটু কিছু শব্দ হলেই।

ইতিমধ্যে বাথরুম থেকে ঘুরে এসেছে রোবের্তো। স্নানও করেছে, কিন্তু সেই ডোরাকাটা পাজামা আর হিন্দুস্থানী ফতুয়া।

দুপুরে খেতে এসে গুরুদাস বলে গেছেন, না না, জামাকাপড় দেওয়া যাবে না। পোশাক দেওয়া মানেই আশ্রয় দেওয়া।

চারুবালা বললেন, জমাদারকে দেখলে একবার ডাকিস যেন। অর্থাৎ সব ধোয়ামোছা করতে হবে।

ইন্দ্র মাকে ঠিক বুঝতে পারে না।

মা কত যত্ন করে রোবের্তোকে খেতে দিল। ভাত তরকারি মাছের ঝোল।

কিন্তু সেই পার্বতিয়ার বাসনে। তাতে অবশ্য ইন্দ্রর আপত্তি নেই। কিন্তু অস্পৃশ্য লোকটা ব্যবহার করেছে বলে বাথরুমও ধোয়ামোছা করতে হবে।

ঘৃণা, ঘৃণা, ঘৃণা। মানুষ কত রকমের ঘৃণা জানে। এই উদ্বেগ অশান্তির মধ্যেও মা ভুলতে পারছে না। মার চোখে ওঁরাও মুণ্ডা আর সাহেব একই।

ইন্দ্র বলেছিল, বাঙালীই তো সবচেয়ে নোংরা জাত মা, সাঁওতালরাও অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাঙালীর ঘরে কোন রুচি নেই, নিজের দরজায় নিজেই নোংরা ফেলে।

চারুবালা শুধু হেসেছেন ওর কথায়।

ইন্দ্রর মনে হয়েছে মানুষের চরিত্রের মধ্যেই হয়তো একটা সঙ্কীর্ণতা আছে। গুটিয়ে আনতে আনতে ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠী করে ফেলে। ভাবে তারাই শ্রেষ্ঠ। তাদের দেশ, তাদের ভাষা, তাদের ধর্ম সবই যেন উৎকৃষ্ট। কাউকে রীতিনীতির পার্থক্যের জন্যে ঘৃণা করে, কারো অন্যরকম আচারবিচার দেখলে। সংখ্যায় বেশি হলেই আর টাকার জোর থাকলে তারাই বড়ো। কিংবা রাষ্ট্রশক্তি হাতে থাকলে। যেমন সাহেবরা নেটিভদের ঘৃণা করে।

এই সব একদিন অনুপম বলেছিল। বলেছিল, আমরা একদিকে মানুষকে ভালবাসি, আরেকদিকে তাকেই ঘৃণা করি।

চারুবালাকে দেখেও তাই মনে হয়।

দুপুরে নিজেই রোবের্তোর ভাতের থালা নিয়ে গিয়ে দিয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে দেখেছেন।

রোবের্তো মাছের টুকরোটা নিয়ে কাঁটা ছাড়াতে গিয়ে তখন হিমসিম খাচ্ছে।

চারুবালা হেসে ফেলে বলেছেন, ছেলের কাণ্ড ছাখো।

ঐ সব কথা মনে পড়ছে বলেই নীপার খারাপ লাগছে। দুপুরটাও কেটে গেল দেখে নীপার মনেও অনেকখানি শান্তি এসেছিল। কিন্তু আর কতক্ষণ।

—জমাদারকে দেখতে পেলে একবার ডাকস।

যে-কেউ বাড়িতে এসে পড়তে পারে এই আতঙ্কে সকলেই তটস্থ হয়ে আছে। পার্বতিয়া আর বিরজুকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলেছে মা। অথচ...

কিন্তু রোবের্তোকে মিলিটারির হাতে তুলে দেওয়ার পর সেও তো ঘৃণা করবে আমাদের। নীপা ভাবলো।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যানার্জিবাবুর ঘটনাটা মনে পড়ে গেল।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ড হিল্ সাহেব একবার ব্যানার্জিবাবুকে কানে পৈতে জড়িয়ে ইউরিনালে যেতে দেখে কি একটা বিচ্ছিরি রসিকতা করেছিল, উমার কাছে শুনেছে। তারপর সে কি ঘুষোঘুষি। ব্যানার্জিবাবুই মার খেয়েছিলেন। রোগা, টিংটিঙে ব্যানার্জিবাবু ঐ দানবের মত লোকটার সঙ্গে পারবে কেন।

এও এক ধরনের ঘৃণা।

—সর্বনাশ হয়ে গেছে রে, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

গুরুদাসের কথায় নীপা ইন্দ্র সবাই চমকে উঠলো। চারুবালার মুখেও উদ্বেগ।

—আবার কি হল? চারুবালা বলে উঠলেন।

মিলিটারি স্পেশালটা জন পঞ্চাশেক ইটালিয়ান পি ও ডবলুকে নিয়ে চলে যাওয়ার পরই ফিরে এলেন গুরুদাস। একটা বিধ্বস্ত মানুষ।

বুশ কোটের বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, আমি আর ভাবতে পারছি না। হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, সেই কালসাপটা কোথায়?

ওরা প্রথমটা বুঝতেই পারে নি। তাই একটু থমকে গিয়ে ইন্দ্র বললে, কালসাপ বলছো কেন, ও তো আমাদের কোন ক্ষতি করেনি।

চারুবালা ইন্দ্রর কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন।—কি হয়েছে, আগে বলবে তো!

গুরুদাস পোশাক বদলালেন না। নীপা ওঁর লুঙি আর গেঞ্জি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তা দেখে বললেন, পোশাক ছাড়বো কি রে, আবার স্টেশনে যেতে হবে না?

তারপর ধপ করে চেয়ারটায় বসে পড়লেন।—চব্বিশ ঘণ্টা, ভাবতে পারছিস, টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স হতে চললো। অথচ এখনো ওদের খবর দিতে পারলাম না।

চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে হাতে মাথা রাখলেন গুরুদাস। বোঝা গেল গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন।

একে একে সমস্ত ঘটনাটা বললেন। চোখের সামনে দিয়ে কিভাবে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে, হুইটলি আর বেল শেষ মুহূর্তে এসেও হঠাৎ ট্রেনে উঠে পড়েছে।

—কোথায় গেল, কবে ফিরবে কিছুই জানি না। এখন আর কাকে বলা যায় তাও বুঝতে পারছি না।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, পুলিস, পুলিসকেই বলতে হবে। কিন্তু তারাও বলবে, এত দেরীতে কেন! তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, বলে উঠলেন, ডাক্তার হাজরাই একমাত্র ভরসা। থানার লোকদের সঙ্গে ওঁর বেশ চেনাজানা আছে। ইন্দ্র, তুই কি বলিস?

দেখে বোঝা গেল খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। খুবই চিন্তিত।

ইন্দ্র ধীরে ধীরে বললে, ডাক্তার হাজরা খুবই ভাল মানুষ। কিন্তু এ ব্যাপারে কি নিজেকে জড়াতে চাইবেন? এমন একটা রিস্কি

ব্যাপার। তা ছাড়া, উনি তো বাইরের লোক, যদি বলে বসেন এসবের মধ্যে আমি নেই, আপনিই থানায় যান…

গুরুদাসকে দেখে মনে হল চোখের আড়ালে আতঙ্ক চুপ করে আছে। বললেন, ঠিকই তো, তখন আবার সব কথা বলে ফেলার জন্যে নতুন ঝামেলা না বেধে যায়। সেই ভয়েই তো বকশিদের কাউকে বলিনি।

একটু থেমে বললেন, যে লোকগুলোকে এত বিশ্বাস করতাম, এই বিপদে পড়ে কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছি না।

নীপা বিমর্ষ হাসি হাসলো বাবার দুর্ভাবনা দেখে। বললে, আর ঐ রোবের্তোকে ছাখো, আমাদের বিশ্বাস করে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোলো রাত্রে। এখনো ভাবছে আমরা ওকে বাঁচাবো।

—আমরাই যদি থানায় যাই, নিজেরাই গিয়ে বলি। ইন্দ্র বললে।

আর গুরুদাস বললেন, সেখানেই তো একটা মুশকিল হয়ে আছে। ইন্সপেক্টরটার সঙ্গে একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। তা স অবশ্য ধরিনি, টি টি সি দুটো ডবলু টি ধরেছিল, উইদাউট টিকেট, লোকটার কেউ হয়, এসে খুব চোটপাট করছিল, আমি রেগে গিয়ে লোক দুটোকে জি আর পিতে হ্যাণ্ডওভার করে দিয়েছিলাম।

চারুবালা বলে উঠলেন, পাগল হয়েছো, তার কাছে যায় কখনো; ও তো এখন সুযোগ পাবে, শোধ নেবে। তোমারও এমন কাণ্ড, দুটো লোক টিকিট কাটেনি, সে তো রেলের ক্ষতি, তোমার অত মাথা-ব্যথাই বা কেন। সব লোককে এভাবে চটিয়ে রাখো…

গুরুদাস হতাশ গলায় বলে উঠলেন, সকলকে কি করে যে খুশি রাখতে হয় তাই যে জানি না।

মনে হল গুরুদাস যেন কান্নায় ভেঙে পড়বেন।—পুলিসের কথা আমি তো ভাবিনি সেজন্যেই।

গুরুদাস স্টেশনে চলে গেলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে কোন সুরাহা করতে পারলেন না। এদিকে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বরকাকানা থেকে ট্রেন এসে পড়বে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন।

বাবার দুশ্চিন্তা দেখে নীপার মনেও উদ্বেগ উঁকি দিল। স্বগত উক্তির মত বললে, বাবা ঠিকই বলেছে, কালসাপ।

নীপার মনে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ক্ষণেক্ষণে রঙ পাল্টাচ্ছে। রোবের্তোকে দেখলে, ওর দেবশিশুর মত সরল মুখের কৃতজ্ঞতা, ওর নির্ভরতা, বিশ্বাস দেখলে মায়া হয়। ইচ্ছে করে ওকে বাঁচাতে। পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে। কিন্তু যখনই বাবার দুশ্চিন্তা দেখছে, নিজেদের বিপদের কথা বুঝতে পারছে, তখনই নির্মম হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।

নীপার মনে পড়লো দুপুরে খেতে বসে বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, ওকে খেতেটেতে দিচ্ছিস তো!

চারুবালা উত্তর দিয়েছেন, ও মা, কি কথাই বলছো। একটা বাচ্চা ছেলে, আমার ইন্দ্রর বয়সী, কোন তেপান্তর থেকে এসেছে, বাড়িতে উপোস করে থাকবে? জেলখানায় ফাঁসির আসামীকেও তো খেতে দেয়।

নীপা বেশ টের পেয়েছে রোবের্তোর জন্যে সকলের মনের মধ্যেই একটা গোপন মমতা লুকিয়ে আছে। বাইরের ভয়ে, মানুষগুলো বদলে যাচ্ছে। আমি নিজেও।

গুরুদাস চলে গেলেন।

দুঃখের হাসি হেসে নীপা বললে, দাদা, এই যুদ্ধ একদিন তো থেমে যাবে। কে ফ্যাসিস্ট কে ইমপিরিয়েলিস্ট এসব ছেঁদো কথা কারো মনেও থাকবে না। আবার হয়তো সকলে সকলের বন্ধু হয়ে যাবে।

ইন্দ্র সায় দিল।—ঠিক বলেছিস। তখন আর কারো পিঠে কোন ছাপ থাকবে না, সবাই মানুষ। দল হলেই মানুষ খারাপ হয়ে যায়, অথচ রোবের্তো একা, কত ভাল। ঐ ব্রিটিশ সোলজাররা, ইউনিফর্ম পরলেই অন্য মানুষ। কিন্তু একা একা···

চারুবালা শুনছিলেন। ধীরে ধীরে বললেন, তোদের কথা সব বুঝি না। ঐ ক্যাম্পে জালের ওপারে বন্দীগুলোকে দেখেও বুঝতে পারিনি।

কিন্তু এই ছেলেটাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানিস, মানুষ মানে কারো ছেলে কিংবা মেয়ে, কারো বাবা কিংবা মা, কারো স্বামী কিংবা স্ত্রী। কিংবা কারো বন্ধু।

একটু থেমে বললেন, ঐ যে দুটো ওঁরাও মেয়েকে মিলিটারি ট্রাক চাপা দিয়ে গেল সেদিন, সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। মানুষ বলেই তো।

নীপা অবাক হয়ে যাচ্ছিল মা'র কথা শুনে। মা এমনভাবে ভাবতে পারে, এত সুন্দর করে বলতে পারে ওর ধারণাই ছিল না। ওর বুকের মধ্যে মা'র জন্যে কেমন একটা গর্ব হল। মা যেন অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে ওর চোখে।

ইন্দ্রও হয়তো অবাক হয়েছিল। ও হেসে উঠে নাটক করার ভঙ্গিতে মাকে জড়িয়ে ধরলো। —মা, তুমি, কি বলবো, ইউ হ্যাভ এ গোল্ডেন হার্ট।

ইন্দ্রর চোখে জল এসে গেল।—তবু, তোমার কেন এত ছোঁয়া-ছুঁইয়ের বাতিক। সাহেব অস্পৃশ্য, পার্বতিয়া অস্পৃশ্য, মানুষকে তুমি এত ছোট করো কেন? নিজে এত বড়ো হয়েও।

চারুবালা হাসলেন।—সে রোগ আমার যাবে না রে। তোরা তখন বলছিলি যুদ্ধ নাকি মানুষকে একটা যন্ত্র বানিয়ে দেয়। আমাদের এই সমাজটাও তাই, মানুষকে মানুষ থাকতে দেয় না। যন্ত্র বানিয়ে দেয়। আমি মুক্তি চাইলেও যে মুক্তি পেতে দেবে না।

ইন্দ্র ধীরে ধীরে বললে, মা, একদিন তোমার এই সমাজ তো বদলে যাবে, সেদিনের লোকরা আমাদের কত ছোট ভাববে। যারা সতীদাহ করতো, কন্যা বিসর্জন দিতো, অসুস্থ বুড়োদের অন্তর্জলি করতো, আশি বছরের বুড়োর সঙ্গে একশো ষাটটা মেয়ের বিয়ে দিত, তাদের আমরা তো অশিক্ষিত নীচ বর্বর ভাবি। যদিও তারা আমাদের পূর্বপুরুষ। শাস্ত্র মুখস্থ বলতে পারতো বলেই তাদের শিক্ষিত বলি না। তারা তো বর্বর।

নীপা কি ভাবছিল কে জানে। হঠাৎ বললে, দাদা, সমাজ বদলেছে বলেই তুই তাদের বর্বর বলছিস, অশিক্ষিত বলতে পারছিস। এই রোবের্তোর কথাই ভেবে ছ্যাখ, ওকে যদি আমরা ধরিয়ে দিই কিংবা তাড়িয়ে দিই, আর ও গুলি খেয়ে মরে, যখন সব বদলে যাবে, যুদ্ধ থেমে যাবে, তখন অনুশোচনায় আমাদেব কি খারাপ লাগবে। তখন মনে হবে একটা লোক আশ্রয় চেয়েছিল···

চারুবালা হঠাৎ বললেন, ওসব তত্ত্বকথা রাখ, কে কখন এসে পড়বে, এই বেলা ছেলেটাকে খেতে দে।

বললেন, কিন্তু নিজেও উঠলেন। নীপাও গেল মাকে সাহায্য করতে।

চারুবালা রান্নাঘরে এসে চাকি বেলনা নামালেন। বললেন, দাঁড়া, রুটিগুলো বেলে দিই।

নীপা অবাক হয়ে বললে, রুটি ?

ও এর আগেই দেখেছে, মা থালায় আটা মাখছে। ভেবেছিল, বিকেলের জলখাবার হবে।

চারুবালা হেসে বললেন, ওর মুখে ভাতডাল কি আর রুচবে ? ওরা তো রুটি খায়। ডিমের ডালনা করেছি।

শেষে চারুবালা থালা সাজিয়ে নিজেই নিয়ে গেছেন। আর তা দেখে রোবের্তো দারুণ খুশি। কি করে সম্মান জানাবে যেন ঠিক করতে পারছে না। মুখে সেই অনোরাতা, অনোরাতা।

নীপা একটা আসন পেতে দিল থালাটার সামনে। ইন্দ্র বললে, সীট হিয়ার।

আর সারাদিন ওকে মেঝেতে বসে থাকতে হচ্ছে বলে পাশের ঘর থেকে একটা চেয়ার এনে রাখলো।

রোবের্তো সকলের মুখের দিকে তাকালো। হাসলো। আর আসনটা সরিয়ে দিয়ে বসে পড়লো।

চারুবালা ওর জন্যে ডিমের ডালনা করেছিলেন, তবু সকলের জন্যে করা মাছের ঝোলের এক টুকরো মাছও না দিয়ে পারেন নি।

নীপা তখন হেসে লুটোপুটি। —মা দেখে যাও, ওকে আবার মাছ দিয়েছো, কাণ্ড ছ্যাখো।

চারুবালা কপাটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কাছে গিয়ে বললেন, খেতে হবে না, খেতে হবে না।

ইন্দ্র হাত নেড়ে ওকে মাছ খেতে নিষেধ করলো।

মেঝেতে বসে খেতে অসুবিধে হচ্ছিল ওর। একটা পা মেলে রেখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসেছিল।

রোবের্তো থালাটা হঠাৎ হাতে তুলে নিল।

বললে, সিস্তেমা ?

বুঝতে পারেনি দেখে নীপার দিকে তাকিয়ে ইশারায় কি যেন প্রশ্ন করলো। চেয়ারটা দেখালো, আর মেঝেটা দেখিয়ে বললে, সিস্তেমা ? কসতিউমে ?

ইন্দ্র হেসে ফেলে বললে, ইয়েস ইয়েস, ইউ মে…

হাসতে হাসতে বললে, নো সিস্তেমা।

রোবের্তো কথা বুঝলো না, কিন্তু এটুকু বুঝলো চেয়ারে বসে খাওয়ায় কোন আপত্তি নেই।

ইন্দ্র চারুবালার দিকে, নীপার দিকে তাকিয়ে বললে, ও বোধহয় ভেবেছে মেঝেতে না বসলে অন্যায় হবে।

রোবের্তো তখন চেয়ারে গিয়ে বসেছে, ওর দু উরুর ওপর থালাটা রেখে খেতে শুরু করেছে।

চারুবালা চলে গেলেন। আর খাওয়াদাওয়া হয়ে যেতেই নীপা থালাবাসন নিয়ে গেল। একটু পরে আবার ফিরে এলো।

আর রোবের্তো উঠে দাঁড়িয়ে নীপাকে চেয়ারটা দেখিয়ে ইঙ্গিতে বসতে বললে।

নীপা অস্বস্তি বোধ করলো, তাই ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, আহা রে, আমার আর কাজ নেই, ওর সঙ্গে বসে গল্প করবো।

রোবের্তো কথা বুঝলো না, বোকা বোকা হাসলো।

তারপর ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললে, ফুমারারে ? কি যেন চাইলো।

ইন্দ্র প্রশ্ন করলো, হোয়াট ?

—সিগারেত্তি। দুটো আঙুল ঠোঁটের কাছে ধরলো।

নীপা হেসে বলে উঠলো, ওমা সিগারেট চাইছেরে। আব্দার কম নয়।

ইন্দ্র উঁকি মেরে দেখলো মা আসছে কি-না। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে লুকোনো জায়গা থেকে সিগারেট আর দেশলাই এনে দিল।

নীপা রোবের্তোকে সিগারেট ধরাতে বারণ করলো।—নট নাও।

রোবের্তো বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে তাকালো।

আর নীপা ঠোঁটে আঙুল রেখে বললে, অনোরাতা। বলে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল।

রোবের্তো বুঝলো না কিছু। তবু ধরালো না।

তারপর নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বললে, আই রোবের্তো পিয়েরোনি।

নীপার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ইউ ?

—বলিস না দাদা। নীপা বললে। রসিকতার স্বরে বললে, তোমার এত নাম জানার শখ কেন সাহেব। আগে প্রাণে বাঁচো ?

নাম বলবে না বুঝতে পেরে রোবের্তো হেসে ইন্দ্রকে বললে, ইউ মিকেলে।

রোবের্তো নীপার দিকে তাকিয়ে বললে, ইউ জুলিয়েত্তা।

ইন্দ্র হো হো করে হেসে উঠে বললে, তোকে জুলিয়েট বলছে নাকি ?

কিন্তু নীপা হাসতে পারলো না, ও দারুণ লজ্জা পেয়ে গেল। ও লজ্জা লুকোবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রোবের্তোর মুখ দেখে মনে হল ও যেন একটা অন্যায় করে ফেলেছে। কিন্তু অন্যায়টা কি বুঝতে পারছে না।

সারাদিনটাই ওদের আরেক ধরনের আতঙ্কে কেটেছে। কেউ

এসে পড়তে পারে। খিড়কির দরজায় কেউ কড়া নাড়লেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। একবার একজন খালাসি এসেছিল। কালো কুচকুচে ছাতার কাপড়ের হাফ-হাতা শার্ট গায়ে। কাপড়টাই কালো, না ইঞ্জিনের তেল কয়লা লেগে কালো হয়েছে জানবার উপায় নেই। কয়েক ঝুড়ি কাঁচা কয়লা খিড়কিব বাইবে ফাঁকা জায়গাটায় ফেলে দিয়ে আগুন ধবিয়ে দিয়ে গেছে। ধোঁয়াব দৈত্যটা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে আকাশে উঠছে। তাব পাশেই একটা কুয়ো, এখন পতিত হয়ে পড়ে আছে। দেহাতি ঝি-চাকববা দড়ি টেনে টেনে বালতি কবে জল তোলে কখনো সখনো, হাত পা ধোয়। যখন কল ছিল না, তখন ওটাই ব্যবহার হত। চাবপাশ শানবাঁধানো।

ঐ খিড়কিব দরজা দিয়ে সেই যে অনুপম চলে গিয়েছিল, প্লাটফর্মে টমিগুলোকে উলঙ্গ হয়ে স্নান কবতে দেখে, কাকস্নান, তাবপর আর আসেনি।

নীপার ইচ্ছে করছিল একবাব গিয়ে দেখা কবতে। যাকে ভালবাসা যায়, তাকে বাববার দেখতে ইচ্ছে কবে। বুকেব মধ্যে চাপা গোপন ভালবাসায় আরো। আব সেই সব সময়ে, যখন ভিতরে ভিতরে বন্ধন নিবিড় হয়ে চলেছে, কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি, দ্বিধাব মধ্যে অস্ফুট হয়ে আছে, তখন পৃথিবীটা খুব সুন্দর হয়ে থাকে। আব সেই সময়ে দুজনেব সামনে কোথাও কোন কদর্যতা দেখা দিলে সুন্দর পৃথিবীটা হারিয়ে যায়। রাস্তার ছেলের নোংবা টিপ্পনি, অভিভাবকেব সন্দেহ, পুলিসের প্রশ্ন। কিন্তু প্লাটফর্মের ঘটনাটা যেন আবো কুৎসিত। নীলপরী মেয়েগুলোর থেকে একটু দূবে এই বীভৎসতা। এব নাম যুদ্ধ।

নীপার ভালবাসার মন চাইছিল অনুপম আসুক। ওদের সম্পর্কটা আবার সহজ হয়ে যাক।

রোবের্তোকে নিয়ে যা-কিছু মজা, বোকা লোকটা কখন কি বলেছে, কখন কি করেছে, অনুপমকে বলার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে ও। ওকে সব বলতে বলতে নীপা নিশ্চয় কৌতুকে হেসে লুটিয়ে পড়বে। জানো

মশাই, আমাকে জুলিয়েগুা বলেছে। নিজেকে রোমিও ভাবছে কিনা কে জানে। ওকে নমস্কার করতে শিখিয়েছি স্যার, তা জানো। গ্রাৎজি গ্রাৎজি বলেছে, বোধহয় ধন্যবাদ।

ভিতরে এ-সব বলার ইচ্ছে থাকলে কি হবে, বাবা কাউকে বলতে নিষেধ করেছে। 'বাইরের কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে'। কি আশ্চর্য, অনুপমকেও বাইরের লোক ভাবতে হচ্ছে। বাবার বিপদের কথা ভেবে।

মনের গভীরে যাই থাক্, অনুপম এখন ওর কাছে একটা আতঙ্ক।

চারুবালা বললেন, কয়লাগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কিনা দেখে আয়। তখনো ধোঁয়া দেখা যায়নি।

খিড়কির দরজা খুলে নীপা দেখলো কুয়োর ওপারে খালাসিট কয়লায় আগুন ধরাচ্ছে।

তারপর পীচ রাস্তার দিকে, বাসটা এসে যেখানে থামে, কখনো দু' একটা ট্যাক্সি দূর দূর কোলিয়ারিতে যায়, আর শনিচারীর হাটের দিকে তাকালো নীপা। যেন অনেকদিন পরে উন্মুক্ত প্রকৃতি দেখছে। একটা প্রিজনার, ওদের ঘরের মধ্যে এসে আবার বন্দী হয়ে আছে বলেই ওরা সবাই বন্দী হয়ে গেছে। সমস্ত চিন্তাভাবনা এই ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ। একটা আতঙ্কের বেড়ায়।

পীচ রাস্তার দিকে চোখ যেতেই হঠাৎ থমকে গেল নীপা। অনুপম না? সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠলো। প্রচণ্ড একটা ভয়। ও ছুটতে ছুটতে এসে বললে, দাদা, কি করবি এখন! অনুপম আসছে। চারুবালাও শুনলেন।

অনুপম এলে সবাই খুশি হয়। ইন্দ্র তো একেবারে মশগুল হয়ে থাকে। নীপার বুকের ভিতর ফুলঝুরি তারা ফোটায়।

আর এখন। বাবা বলেছে, 'বাইরের কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।'

ইন্দ্র বললে, আমি আগেই ভয় পেয়েছিলাম। অনেক আগে যদি

আমিই চলে যেতাম ওর কাছে, আসবার কথাই উঠতো না।

নীপা বললে, গেলি না কেন ?

চারুবালাও শুনলেন, কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। শুধু বললেন, কখন মিলিটারির লোক এসে পড়ে, তখন তো ইন্দ্রকে থাকতে হবে। আমরা তো কথাই বলতে পারবো না। তোর বাবা একা সামলাতেও পারবে না। ও তো এমনিতেই খুব ভীতু, কিছু একটা ঘটলেই···

নীপা বললে, এক্ষুনি যদি মিলিটারি এসে যেত, তা হলে আর ভয় ছিল না। তখন তো সকলেই জানবে। কিন্তু বাবা বোধহয় এখনো ওদের খবর দিতে পারেনি।

নীপা হঠাৎ বললে, দাদা, তুই ওকে সরিয়ে নিয়ে যা। বাড়ি ঢুকতে দিস না।

মাকে বললে, এলেও চা-টা খাওয়ার কথা বলো না। দেরী হবে। ওকে যত তাড়াতাড়ি পারো···

অনুপম এলো। তার আগেই ইন্দ্র পোশাক বদলে তৈরি হয়ে আছে।

ইন্দ্রর সঙ্গে কি কথা হল কে জানে। অনুপম বাড়ির ভেতর চলে এলো।

হাসতে হাসতে চারুবালাকে বললে, মাসীমা, একটা মজার ছবি এসেছে, টিকিট কেটে আনলাম, এখন দেখুন···

নীপাকে দেখেই বললে, কোন অজুহাত শুনছি না, চলো যেতেই হবে···দারুণ হাসির ছবি।

নীপা বললে, আমার এ-সব বাজে সিনেমা ভাল লাগে না। আর এখানকার যা হল্···।

ইন্দ্র বললে, চল চল, আমার কাজ আছে। ও যাবে না।

অনুপম কখনো এ-রকম ব্যবহার পায় নি। নীপার দিকে তাকিয়ে কোন ক্ষোভের স্বরে বললে, তুমি তো এখন কলকাতার মেয়ে।

এই কথাটা অনুপম প্রায়ই বলে। ও তো রাঁচি থেকে পাশ করে রুরকিতে পড়ছে। কোলকাতা সম্পর্কে ওর একটা বিস্ময়, মুগ্ধতা, আর চাপা তাচ্ছিল্য আছে।

নীপা কি বলবে কিছু ঠিক করতে পারলো না। শুধু বললে, এখন যাও, আমার ওসব ভাল লাগছে না।

অনুপমের মুখটা যেন অপমানে আহত। ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললে, তুইও যাবি না? বেশ।

সব দেখেশুনে চারুবালাকে বলতেই হল, একটু চা খেয়ে যাও।

অনুপম তার দিকে একবার তাকালো, নীপার দিকে। তারপর বললো, নাঃ। বলেই গটগট করে বেরিয়ে গেল। হয়তো রাগে, হয়তো অপমানে।

নীপা কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়লো। আর রোবের্তোর ওপর ওর প্রচণ্ড রাগ হল।

অথচ একটু আগে ও রোবের্তোর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হেসেছে। 'জুলিয়েত্তা' 'জুলিয়েত্তা'। নামটা বুকের মধ্যে রিনরিন করে বাজে।

না, রোমিও জুলিয়েটের কথা ভাবেনি হয়তো রোবের্তো। ইন্দ্রকে বলেছে মিকেলে ওকে জুলিয়েত্তা। এমনি সাধারণ নামই হয়তো। ওদের দেশের নাম।

নীপার মনে হল ও যেন রোবের্তো আর অনুপমের মাঝখানে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আর তার কিছুক্ষণ পরেই মিলিটারি স্পেশালটা এলো। জানলা থেকে ইটালিয়ান প্রিজনারের একটা দল চলে যেতে দেখলো। ওদের হয়তো ছোট ছোট দলে নানা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

ট্রেনটা চলে যেতেই গুরুদাস ফিরে এলেন। আর ইন্দ্রও।

নীপা একবার ইন্দ্রর মুখের দিকে তাকালো। যেন সেই মুখে অনুপমকে খুঁজতে চাইলো। অনুপম কি ওকে ভুল বুঝবে?

তার আগেই গুরুদাস বলে উঠেছেন, সর্বনাশ হয়েছে রে, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

হুইটলি বা বেলকে কিছুই বলা হয়নি।

গুরুদাসকে সমূহ বিপদের সামনা-সামনি দাঁড় করিয়ে দিয়ে তারা চলে গেছে।

সাত

শেষ অবধি আর কোন উপায় খুঁজে পাওয়া গেল না। রাত্রে গুরুদাস স্টেশন থেকে ফিরে এলে তাঁর ঘরে বসে চার মাথা এক হয়েছিল। যদি কোন পথ কেউ বের করতে পারে।

সময়টা খারাপ বলেই গুরুদাসের আরো ভয়। একটা বছরও যায় নি, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট হয়ে গেছে। সে কি প্রচণ্ড আলোড়ন। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে চিৎকার যেন এখনো কানে লেগে আছে। গুলির শব্দ এখন স্তিমিত। তবু হঠাৎ হঠাৎ কোথাও থানায় আগুন জ্বলে, বোমা ফাটে। ওদিকে গুজব শোনা যায় সুভাষ বসু নাকি সৈন্য নিয়ে, ভারতীয় সৈন্য নিয়ে, বর্মার দিক থেকে এগিয়ে আসছেন। ব্রিটিশ বর্মা ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। সেজন্যে ইণ্ডিয়ানদের ওরা একটুও বিশ্বাস করে না। আর সেই সময়েই কিনা ওঁর বাড়িতে একটা ইটালিয়ান প্রিজনার আশ্রয় পেয়েছে!

গুরুদাস বললেন, ডাক্তার হাজরা ছাড়া আমি আর কারো কথা ভাবতে পারছি না। এখন একমাত্র উনিই হয়তো কিছু একটা বুদ্ধি দিতে পারেন।

কিন্তু এত রাত্রে কি যাওয়া ঠিক হবে। অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই লোকের চোখে পড়বে। কোথাও কোন স্পাইটাই আছে কিনা কে জানে। কে যে স্পাই তা বোঝাও মুশকিল। আরগাডা কোলিয়ারি থেকে একটা ছেলেকে তো এই সেদিন কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেল। মুভমেণ্টের সময় নাকি টেলিগ্রাফের তার কেটে বেড়াতো। এসে কোলিয়ারিতে চাকরি করছিল নাম ভাঁড়িয়ে। জানলো কি করে, স্পাই যদি না থাকবে।

শেষ অবধি ঠিক হল, না রাতটা কাটাতেই হবে। পরের দিন ইন্দ্র

আর নীপা যাবে ডাক্তার হাজরার কাছে, সব বলবে। গুরুদাসের যাওয়ার কোন উপায় নেই। স্টেশন ছেড়ে যেতে পারবেন না। যদি বা কিছু একটা অজুহাত দিয়ে ঘণ্টা কয়েক ছুটি নেন, বকশিদের ওপর ভার দিয়ে, তা হলেও ওদের সন্দেহ হতে পারে। অসুখ-বিসুখ নেই, ডাক্তার হাজরার কাছে যাচ্ছেন কেন!

—সব গুছিয়ে বলতে পারবি তো?

ইন্দ্র ঘাড় নাড়লো।

কিন্তু নীপা একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছে তখন। এই কথাটা যদি বাবা আগেই বলতো। আজই অনুপমকে একরকম তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা। অনুপমের লাঞ্ছিত আহত মুখখানা যেন দেখতে পাচ্ছে নীপা।

তার আড়ালে একটা প্রচণ্ড রাগ।

সিনেমার টিকিট কাটার কথা তো ইন্দ্রই বলেছিল। আসলে সিনেমা দেখা তো নয়, একটা হৈ হৈ করা। এই নিঃসঙ্গ জায়গায় একটু বৈচিত্র্য উপভোগ করা।

কিন্তু নীপা কথাগুলো এমন ভাবে বলে ফেললো, যেন অনুপমের রুচিকেই ও ঠাট্টা করছে। যেন অনুপমের উপস্থিতি ওর ভাল লাগছে না। কেন করলো? শুধুই ঐ কাল-সাপটাকে গোপন করার জন্যে? নাকি ভিতরে ভিতরে রোবের্তোকে ওর ভাল লেগে গেছে? নীপা নিজের মনেই হেসে ফেললো। অসম্ভব। কিন্তু অনুপম পরে যখন জানবে ওর কথা, কিছু ভেবে বসবে না তো?

নীপার সেজন্যেই বড় অসহায় লাগছিল। ও তো অনুপমকে বিশ্বাস করে। জানে, ওদের কোন ক্ষতি হয় এমন কিছু করা ওর দ্বারা সম্ভব নয়। ওকে বললে বরং ও কিছু সাহায্য করতো, বুদ্ধি দিতে পারতো। শুধু বাবার নিষেধের জন্যেই বলতে পারে নি।

এখন গিয়ে সেই অনুপমের বাবার কাছেই সব কথা বলতে হবে।

—বলবি, ব্যাপারটা গোপন রাখতে। বাড়ির কাউকে যেন না বলেন।

গুরুদাস বলেছিলেন।

নীপার কান্না এসে গিয়েছিল। যেন অনুপমের সঙ্গে ও একটা প্রচণ্ড প্রবঞ্চনার খেলা খেলছে। বাবা ঠিকই বলেছিল, কালসাপ। ঐ রোবের্তো।

পরের দিন ইন্দ্রর সঙ্গে যখন বের হল, নীপার বুক কাঁপছে। নীপার নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে। বাবা কি করে আশা করছে, ডাক্তার হাজরা তাঁর স্ত্রী কিংবা ছেলেকে কিছু বলবেন না। তখন অনুপম কি ভাববে! নীপা আমাকেও বিশ্বাস করে না।

অনুপম রাজনীতি করে না, রাজনীতিতে ওর কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু জার্মানদের একেবারে পছন্দ করে না। ওরা ইহুদীদের নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল। কত বড় বড় বিজ্ঞানীকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। ইটালিয়ানদের সেজন্যে হয়তো ঘৃণাও করে। ওরাও তো অ্যাক্সিস পাওয়ার। জার্মানদের বন্ধু। অন্যের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চায়। জাপানও।

এসব কথা শুনে ইন্দ্র বলেছিল, এ তোর আত্মবিশ্বাসের অভাব। দুশো বছরের ইংরেজ শাসন যদি আন্দোলন করে সরিয়ে দেওয়া কোনদিন সম্ভব হবে বিশ্বাস করিস অনুপম, তাহলে একটা নতুন শক্তি, যে ভারতবর্ষের কিছুই জানে না, তাকে ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে কেন? আত্মবিশ্বাস না থাকলে তো ধরে নিতে হবে দেশ কোনদিনই স্বাধীন হবে না।

নীপার এই সব কূটতর্কে কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু অনুপম যখন সব কথা জানতে পারবে তখন ভেবে বসবে, আমিও ওর পিঠে একটা ছাপ দিয়ে দল বানিয়ে দিয়েছি। ওকে বিশ্বাস করি নি। আর তাই সবকিছু ওর কাছে গোপন রেখেছি।

শনিচারীর হাটের দিকে, ডাক্তার হাজরার বাড়ির দিকে যেতে যেতে সেজন্যেই ওর এত অস্বস্তি হচ্ছিল।

খিড়কির দিকের ঢল বেয়ে তরতর করে নালাটার কাছে নেমে এলো দুজনে। নীপা ইন্দ্র। লাফ দিয়ে নালা পার হল। কংক্রিটের কালভার্ট অনেকখানি দূরে। ওটার ওপর দিয়ে জীপ যায়, গাড়িটাড়ি। ডাক্তার হাজরা কোথাও এ পথে রুগী দেখে ফেরার সময় টাঙ্গা চালিয়ে একেবারে কোয়ার্টারের সামনে এসে থামেন।

পীচের রাস্তার ধারে খানকয়েক দোকান। একটায় তেলেভাজা বিক্রি করে, দেহাতি মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। লোকটা অনেক দূরের কোন গ্রাম থেকে আসে, সন্ধ্যের আগেই দোকান বন্ধ করে চলে যায়। ডাক্তার হাজরার ওষুধের ছোট্ট দোকান একটা, বুড়ো কম্পাউণ্ডারই কেনাবেচার সেলসম্যান। সেও সন্ধ্যের আগেই চলে যায়। তখন ভুতুড়ে শূন্যতা নিয়ে দোকানগুলো পড়ে থাকে।

পীচ রাস্তা ছেড়ে মাঠ ধরে এগিয়ে গেল নীপা আর ইন্দ্র। শনিচারীর হাটের দিকে। আজ আর বাজপেয়ীজীর বাড়ি যাবে না, চাচীকে বলবে না, হালুয়া বানাও। আজ এ সবের অবকাশ নেই।

উদ্বেগের চোখে প্রকৃতির রূপ বদলে যায়। হয়তো মানুষও।

এঁকেবেঁকে যতখানি সম্ভব গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে চলেছিল ওরা। আগে প্রচুর গাছ ছিল, ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া যেত। ঠিকাদাররা ক্রমাগত সেগুলো কিনে নিয়ে কেটে ফেলেছে। শালবল্লীর লোভে। পি ও ডবলু ক্যাম্প তো পুরো শালবন ছিল একসময়। এখন একেবারে ন্যাড়া।

এখানে দুপুরের একটা সুন্দর রূপ আছে। সূর্য এখানে রুদ্র, আর মাটি-পাথর রুক্ষতায় ঢাকা। সমতল বলে কিছুই প্রায় নেই। যতদূর চোখ যায় পায়ের তলার মাটি কোথাও ঢলে নেমে গেছে, কোথাও আবার ঢেউয়ের মত মাথা তুলেছে। সমস্ত আকাশই যেন সূর্য। মাটির ঢেউ সবুজহীন প্রান্তর রোদ্দুর মেখে হলুদ হয়ে আছে। মাটির ওপর একটা পুরো বাতাসের আস্তরণ যেন উষ্ণতায় ফুটছে, তিরতির তিরতির করে জলের স্রোতের মত কাঁপছে। দূরে কাছে দু-একটা তিতির ডেকে

ওঠে। আর এই হলুদ রোদ্দুরে প্রান্তর জুড়ে হঠাৎ হঠাৎ ছোপ ছোপ কুঞ্জ হয়ে ওঠা গাছের ছায়ায় কালো কালো ছাপ। যেন একটা হলুদ শাড়ির ওপর কালচে সবুজ নকশা। ঐ ছায়ার দিকে তাকালেও যেন রোদ্দুর ঝলসানো চোখে ঠাণ্ডা প্রলেপ অনুভব করা যায়। ঐ মাঠ পেরিয়ে অনেক দূরে দূরে দু-এক টুকরো ক্ষেতিজমি। সবুজের দ্বীপ। জনার বজরার ক্ষেত হয়তো। গাছের নীচে ছায়ায় দড়ির খাটিয়ায় বসে একটা বাচ্চা ছেলে, কোমরে ঘুনসি, পোড়া ভুট্টা খাচ্ছে।

কিন্তু নীপার এখন ঐ ছেলেটাকে আদর করার সময় নেই। যতই ডাক্তার হাজরার বাড়ির কাছে এসে পড়ছে ততই উদ্বেগ।

চারুবালা বলেছেন, ডাক্তার হাজরা আবার রাজভক্ত নন তো ?

গুরুদাস হেসে উঠেছেন।—হলেই বা। আমরা তো লোকটাকে ধরিয়েই দিতে চাই।

চারুবালাকে কেমন বিমর্ষ দেখিয়েছে। —না, বলছি যদি ওর বাঁচার কোন রাস্তা থাকতো। খেতে দেবার সময় এমন মুখ করে তাকাচ্ছিল।

গুরুদাস বলেছেন, এই দুটো দিনে সব পাল্টে গেছে। তখন আমরা এমন জায়গায় ছিলাম যে হয় ও বাঁচবে কিংবা আমি, আমরা বাঁচবো। এখন আর ওর বাঁচার কোন রাস্তা নেই, আমরা বাঁচবো কিনা সেটাই সন্দেহ। ঐ প্রিজনারটাকে, এবং আমাদের হয়তো একই দলে মনে করবে।

সেই দল। গোষ্ঠী। জাত, ধর্ম, ভাষা, রাজনীতি, দেশ।

ইন্দ্র তো মেডিকেল পড়ছে, সে কথাই বোঝাতে চেয়েছিল একদিন।

—জানিস নীপা, মাইক্রোসকোপে যখন মোটাইল অর্গানিজম্‌স, মানে জীবাণু দেখি, ব্যাসিলাই, অনেকগুলো স্পট, দল বেঁধে এক একটা স্পট, কিন্তু অনবরত তারা সরে সরে যাচ্ছে, এক দল ছেড়ে আরেক দলে মিশে যাচ্ছে। মানুষও ঠিক তাই। কখনো সে ধর্মের দলে কখনো রাজনীতির, কখনো অর্থের কিংবা স্ট্যাটাসের, কখনো শিক্ষার বা

দলাদলির, কখনো জাতপাতের, কখনো বাঙালী অবাঙালী। আরো ছোট ছোট পরিচয়ের গণ্ডীতে। সর্বক্ষণ সে কোন না কোন দলে। ধর্মের দলে থাকার সময় যে বন্ধু, ভাষার দলে গিয়ে সে শত্রু। অনবরত সে একজনের বন্ধু হচ্ছে, আবার অন্য দিক থেকে শত্রু।

নীপা মন্তব্য করেছে, কারণ কোন সময়েই সে মানুষ হচ্ছে না।

ইন্দ্র হেসে বলেছে, আমাদের সেই সব ঋষিটিষিরাও তোর মত দার্শনিক হয়ে উঠতে পারে নি। তারাও ব্রহ্মা ব্রহ্মা করেছে, যজ্ঞ করেছে, কিন্তু যারা ওসবে বিশ্বাস করেনি তাদের মানুষ ভাবতে পারেনি।

ডাক্তার হাজরার বাড়ির দিকে যেতে যেতে কথাগুলো মনে পড়ছিল।

সব মানুষই কত অসহায়। আমরা দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না। সব মানুষই তো একা। সকলেই রোবের্তো। বাবাও। দাদা, আমি, মা। মনের ভেতরটা কেউ দেখতে পায় না। তারের জাল আর কাঁটা তারের খাঁচায় আবদ্ধ প্রতিটা মানুষ। অসহ্য বন্দিত্ব থেকে, যন্ত্রণা থেকে পালাতে চাইছে। নিজেই নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। সকলেই মুক্তি চাইছে, সেই মুক্তির মধ্যে যদি মৃত্যু থাকে তবু।

হঠাৎ রোবের্তোর মুখখানা নীপার চোখের সামনে ভেসে উঠলো! একেবারে ছেলেমানুষ। মা ঠিকই বলে, বাচ্চা ছেলে।

ওর মনে পড়লো গতকাল বিকেলে মিলিটারি স্পেশালটা চলে যাওয়ার পর বাবা ফিরে এসে বিভ্রান্তের মত বলেছিল, সর্বনাশ হয়ে গেছে, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

শুনে নীপাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। হুইটলি আর বেল ছিল বাবার শেষ আশ্রয়। যাদের কাছে খবরটা জানিয়ে দিতে পারলেই বাবা নিশ্চিন্ত হতে পারতো। কিন্তু ইটালিয়ান প্রিজনারদের একটা দলকে ঐ ট্রেনে সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে গেল, আর তার সঙ্গে হুইটলি আর বেলও চলে গেল।

বাবা বলেছিল, এখন আর কোন উপায় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে, নীপা, বুঝতে পারেনি কেন, ওর বুকের ভেতর একটা আনন্দের ফোয়ারা খুশির জলোচ্ছ্বাস হয়ে গেছে। আসলে ঐ অসহায় মানুষটা আরো কিছু পরমায়ু পেল বলেই হয়তো। কিংবা একটা ক্ষীণ আশা।

গুরুদাস চলে যাওয়ার পর ইন্দ্র বললে, চল নীপা, ওর সঙ্গে একটু গল্প করে আসি। তবু তো আরেকটা রাত ওকে আমরা বাঁচতে দিলাম। তারপর হেসে উঠে বলেছে, মজা দেখ নীপা, ভাগ্যের কি পরিহাস, লোকটা ঐ ক্যাম্পে দিব্যি ছিল, একটু ঘোরাফেরা করতে পেত, ভাল খাওয়াদাওয়া। মুক্তি চাইতে গিয়ে এই ঘরটার মধ্যে বন্দী হয়ে গেল। এখন ও আমাদের দয়ার ওপর নির্ভর করছে।

—দয়া বলিস না। দয়া দেখাবার সাহসও আমাদের নেই। বরং ও আসার পর আমরাই বন্দী হয়ে গিয়েছি। নীপা বলেছে।

ইন্দ্রর সঙ্গে নীপাও এসে ঢুকেছে রোবের্তোর ঘরে।

চেয়ারে বসে ছিল রোবের্তো। ওদের দেখে, নীপাকে দেখেই হয়তো উঠে দাঁড়ালো।

নীপা ইন্দ্রকে বললে, ওরা মেয়েদের কত সম্মান করে দেখেছিস। আর তোরা তো দিব্যি বসে থাকিস, এমন ভাব দেখাস যেন মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকারই কথা। বলে হাসলো।

রোর্বেতো ওর কথা বুঝলো না। হেসে চেয়ারটা দেখিয়ে বললে, সীত জুলিয়েত্তা সীত।

নীপা ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালো, ওর ঠোঁটের ফাঁকে কৌতুকের হাসি।

রোবের্তো আবার ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলো, সিস্তেমা ?

ইন্দ্র হেসে প্রশ্ন করলো, হোয়াট ইজ সিস্তেমা ?

হাতে অদৃশ্য দুটো মোয়া ধরে ঘোরানোর মত করে এমন ভঙ্গি করলো রোবের্তো, ওরা বুঝলো ও কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

তারপর হঠাৎ ভুরু কুঁচকে দুম করে বলে বসলো, কস্তুম ? কাস্তুম ?

—ওরে ও ভেবেছে, মেয়েরা বসে না। আমাদের দেশের রীতি ওটা। নীপা হেসে উঠে বলেছে, ঠিক ধ\`রেছো সাহেব, আমাদের পুরুষরাই শুধু আরাম করে আর হুকুম করে। আমরা বাবা-মার কাছেও খেটে মরি, শ্বশুর বাড়িতে গিয়েও।

রোবের্তোর অস্বস্তি লাগছিল। বললে, মিকেলে, ইউ সীত।

ইন্দ্র গিয়ে ওর তক্তপোষে বসলো। নীপাও।

ওদের বসতে দেখে রোবের্তো আবার চেয়ারে বসলো।

তারপর নীপার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজের চুলের কাছে আঙুল দিয়ে সিথি বোঝালো। বললে, সিনোরিনা, বলে দরজার দিকে আঙুল দেখালো অর্থাৎ মা, তারপর বললে, রসসো। আবার নীপার সিঁথি দেখিয়ে বললে, নো রসসো। একটু ভেবে বললে, রেদ। রেদ।

ইন্দ্র আর নীপা হো হো করে হেসে উঠলো। ইন্দ্র বললে, সী'জ নট ম্যারেড।

নীপা লজ্জা পেল, অস্বস্তি বোধ করলো।

কিন্তু ইন্দ্রর কথা রোবের্তো বোধহয় বুঝতে পারলো না।

ওর হয়তো মনে হয়েছে চারুবালার সিঁথিতে সিঁদুর আছে, নীপার নেই কেন? কিংবা সিঁথিতে সিঁদুর দেখে ওর হয়তো ভাল লেগেছে।

ও আবার মাথার ঘোমটা বোঝালো ইশারায়। চারুবালা মাথায় ঘোমটা দেন।

ইন্দ্র হেসে উঠলো।

তারপরই কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে রোবের্তো। মুখে কেমন একটা বিষণ্ণ ছাপ। নীপার মনে হয়েছে ও যেন ভয় পাচ্ছে।

ইন্দ্র প্রশ্ন করেছে, হোয়াট আর ইউ থিঙ্কিং?

রোবের্তো বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছে, থিঙ্ক? মাথা নেড়ে হেসে ওঠার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ, না কিছু ভাবছি না। তারপর থমথমে মুখে বলেছে, ওমের্তা।

ইন্দ্র বলেছে, চাঁদু, তোমাকে নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়েছি। তুমি না বোঝো আমাদের কথা, আমরা না বুঝি তোমার কথা।

নীপা হেসে ফেলেই হাসি চেপেছে। তারপর ধীরে ধীরে বলেছে, দাদা, আসল কথাটা কিন্তু আমরা সকলেই বুঝতে পারছি। ও বাঁচতে চায়। ও আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। ও আমাদের বিশ্বাস করেছে।

তারপর আবার বলেছে, ভীষণ খারাপ লাগছে রে। ও ভাবছে আমরা ওকে আশ্রয় দিয়েছি, ওকে আমরা বাঁচাবো। অথচ আমরা সকলেই রাস্তা খুঁজছি কি করে আমরা নিজেরা বাঁচবো।

চারুবালা সেই সময়ে দরজার আড়াল থেকে নীপাকে ডাকলেন।

নীপা বেরিয়ে এসে মা'র হাতের দিকে তাকিয়েই স্তম্ভিত। বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো, মা!

বিস্মিত হবারই কথা।

চারুবালা লজ্জা পেলেন। যেন ধরা পড়ে গেছেন। আমতা আমতা করে বললেন, তুই তো বললি, চা খায় না, চিরতা খাওয়ার মত মুখ করেছিল। তাই ভজনলালকে দিয়ে আনালাম।

—তুমি ওকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছো নাকি? নীপা বললে।

—না রে না। দিয়ে আয় এটা।

নীপা কফির কাপটা মার হাত থেকে নিল! হাসতে হাসতে বললে, আর জন্মে তুমি বোধহয় ওর মা ছিলে।

—আর জন্মে কেন রে, মনে হচ্ছে এ জন্মেই। দুদিনেই ছেলেটার ওপর এত মায়া পড়ে গেছে। অথচ কখন হুট করে এসে ধরে নিয়ে যাবে···

নীপা কফির কাপটা নিয়ে গিয়ে রোবের্তোকে দিল।—খেয়ে দেখো সাহেব, এবার পছন্দ হয় কিনা।

ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললে, মা'র কাণ্ড দেখেছিস। কফি আনিয়েছে।

আর তখনই কফির কাপটা নিতে নিতে রোবের্তো বলেছে, গ্রাৎজি, গ্রাৎজি।

তারপর হঠাৎ নীপার হাতের কফির কাপ থেকে সোনার বালায় চোখ পড়েছে, একটা হাত বাড়িয়ে নীপার হাতের বালাটা ধরে বলেছে, নাইস।

আর নীপা সঙ্কোচে লজ্জায় ছিটকে সরে এসে নার্ভাস হাসি হেসে ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললে, ওর কাছে সবই নাইস রে দাদা!

পরক্ষণেই রোবের্তোর দিকে তাকিয়ে বুঝলো ওভাবে সরে এসে ভুল করেছে। রোবের্তো তখন বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে আছে। ও হয়তো সরল ভাবেই কথাটা বলতে চেয়েছে, নীপাই ভুল বুঝেছে। ও তো জানেই না মেয়েদের থেকে দূরত্ব রেখে চলতে হয়। মেয়েদের পুরুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে হয়। আর সেজন্যেই ক্ষণিকের স্পর্শও আমাদের মনের মধ্যে তোলপাড় ঘটিয়ে দেয়। রোমাঞ্চ আনে।

—নীপা, যা বলবার তুই গুছিয়ে বলবি। আমি বলতে পারবো না। ডাক্তার হাজরার বাগানের গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে ইন্দ্র বললে।

একটু থেমে বললে, আমার কেমন নার্ভাস লাগছে নীপা।

গেট থেকে বাগানের মাঝখান দিয়ে মোরম ছড়ানো সিঁথির মত রাস্তা বিরাট চওড়া খোলা বারান্দা অবধি, অনেকগুলো প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। ঐ বারান্দাতেই বেতের চেয়ার ছড়ানো, ডাক্তার হাজরা কখনো কখনো এসে বসেন। প্রতিবেশী কেউ এলে এখানে বসেই গল্পসল্প করেন।

তারের জাল দিয়ে ঘেরা বিশাল বাগান, লোহার গেট, কিন্তু মাঠের মত রুক্ষ পড়ে আছে। দু একটা গাছ এখানে ওখানে। কোন এককালে হয়তো সুন্দর বাগান ছিল, অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে।

টানাটানা লম্বা সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠেও কাউকে দেখতে পেল না নীপা।

ওর তখন প্রবল অস্বস্তি। কি ভাবে গুছিয়ে বলবে। আর অনুপম। যদি থাকে, চোখ তুলে তাকাতেও ভয়। হয়তো প্রচণ্ড

রেগে আছে, কিংবা অভিমান। হয়তো ভেবেছে নীপা ইচ্ছে করেই ওকে অপমান করেছে। অপমানই তো। অনুপম যখন বিমর্ষ মুখে চলে আসছে, তখন ওর মুখ দেখে তাই মনে হয়েছিল।

অনুপমকে ও কি করে বোঝাবে ওর কোন উপায় ছিল না।

পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়তেই অনুপম চোখ তুলে তাকালো। চোখ নামিয়ে নিল ওদের দেখেও।

খাটের ওপর বিছানায় বসে অনুপম, সামনে তাস বিছিয়ে রাখছে। দেখেই বোঝা গেল একা-একা পেশেন্স খেলছে তাস নিয়ে। কখনো বই পড়া, পুরোনো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টানো, নীপাদের বাড়ি গেলে ক্যারম, কিংবা এখানে ওখানে বেড়াতে যাওয়া।

সহজ হবার জন্যে নীপা হাসলো। বললে, শেষে পেশেন্স খেলছো বুড়োদের মত।

অনুপম একটু চুপ করে থেকে বললে, জীবনটাই তো পেশেন্সের খেলা।

নীপা শব্দ করে হাসলো, কৃত্রিম হাসি।

অনুপমকে দেখে ওর ভালও লাগছে, অথচ ভিতরে ভিতরে একটা বিরক্তি। ও না থাকলেই যেন ভাল হতো। অনুপমকে সমস্ত কথা বলে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে, ওদের সমস্যার কথা, বিপদের কথা, অথচ বলার উপায় নেই। ওকে বলার ফলে যদি জানাজানি হয়ে যায়, এখন তো ও আরো রেগে আছে, তা ছাড়া ওর মতামতগুলোও···

নীপা ভাবলো, এই তো আমিও ওর পিঠে একটা ছাপ দিয়ে দিচ্ছি, দল ভাবছি। কে কাকে বন্ধু মনে করে, কাকে শত্রু ভাবে, কার কি নীতি বিশ্বাস, এ-সব তো বাইরের পোশাক। ভিতরে ভিতরে সে তো একজন মানুষ। একা মানুষ।

—ডাক্তারকাকু কোথায় রে ? ইন্দ্র বললে।

অনুপম ইশারায় দেখিয়ে দিল, চেম্বারে। কিন্তু তাস থেকে চোখ তুললো না।

ইন্দ্র নীপাকে বললে, আয়।

সময় নষ্ট করার মত সময় নেই ওদের। মা বাড়িতে একা। তালাচাবি দেওয়া ঘরে রোবের্তো। এখন আর পালাবে সে-ভয়ে নয়, যদি কেউ এসে পড়ে, দেখতে পাবে বলে। বাবা তো স্টেশনে। কেউ বেড়াতে এলে মা সামলাতে পারবে না।

চেম্বারের দরজা খুলে ঢুকলো দু জনে।

—আরে এসো এসো। কারো অসুখ নয় তো ?

নীপা তখন ভয়ে জড়োসড়ো। সমস্ত শরীর যেন শিথিল হয়ে গেছে। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ওঁর টেবিলের দিকে।

আর ডাক্তার হাজরা বলে উঠলেন, মিস তুফান মেল তো সব সময় ঝড়ের মত চলবে। সেজন্যেই ট্রেনটাকে কেউ তুফান মেল নাম দিয়েছিল। হয়তো কোন কুলিটুলি। আর তুমি দেখছি একেবারে গুডস ট্রেনের মত হাঁটছো। কি ব্যাপার, হাঁটুতে চোট লেগেছে নাকি ?

নীপা হাসতেও পারলো না। বুক দুর-দুর করে উঠলো। কোন-রকমে চেয়ার টেনে নিয়ে ও বসলো। পাশে ইন্দ্র।

নীপা হঠাৎ ভেঙে পড়া গলায় বললে, ডাক্তারকাকু, আপনি আমাদের বাঁচান !

ছেলেবেলা থেকেই ওঁকে ডাক্তারকাকু বলে এসেছে নীপা। ওঁর চুলগুলো কুচকুচে কালো বলেই। কোথাও পাক ধরেনি।

ডাক্তার হাজরা ওর গলার স্বরে বিস্মিত হলেন। তাকালেন ওর মুখের দিকে।

বাইরে কল না থাকলে এ-সময়ে চেম্বারেই বসে থাকেন উনি। এখানে কোন সময়েই ভিড় করে রুগী আসে না। সারাদিনই টুকটাক দু একজন আসে যায়। বেশির ভাগই দেহাতি লোক। মিলিটারির কল্যাণে আজকাল অগুনতি ঠিকাদার। কণ্ট্রাকটর। কেউ কেউ ক্যাম্পে মিলিটারিতে ডিম মাংস চিনি, আরো কত কি সাপ্লাই দেয়। ঠিক সময়ে হেডকোয়ার্টার থেকে সাপ্লাই না এসে পৌঁছলে। তার ফলে লোক

বেড়েছে এদিকটায়, তারাও কখনো কখনো আসে, কিংবা কল দেয়। দূর দূর গ্রামেও যেতে হয়।

এক সময়ে কোলিয়ারির ডাক্তার ছিলেন। সাহেব ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানেই প্রাকটিস শুরু করেন।

একটু আগেই দিব্যি রসিকতার সুরে নীপাকে মিস তুফান মেল বলেছেন, কিন্তু নীপার কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল ডাক্তার হাজরাও বিভ্রান্ত মুখে তাকালেন। বোধহয় নীপা খুব চাপা গলায় কথাটা বললো বলে।

ডাক্তার হাজরার মুখে আর মিস তুফান মেল নামটা শোনা গেলো না। নীপার কথা শুনেই বুঝলেন গুরুতর কিছু।

ইন্দ্র বললে, নীপা তুই বল। আমি আসছি।

ইন্দ্র হয়তো অনুপমকে সরিয়ে নিয়ে যাবে. নীপা ভাবলো।

একটু একটু করে কাঁপা কাঁপা গলায় সব কথা বললে নীপা। বললে, ডাক্তারকাকু আপনিই বাবাকে বাঁচাতে পারেন। আপনি ছাড়া আমরা আর কারো কথা ভাবতেই পারছি না।

ডাক্তার হাজরাও যেন নার্ভাস হয়ে পড়লেন।—ইটস এ ফুলিশ অ্যাক্ট অন হিজ পার্ট। তোমার বাবা। এ কি বোকামি করেছেন? মুভমেণ্টে লাইন উপড়ে দেওয়া, তার তবু একটা জাস্টিফিকেশন আছে। কিন্তু প্রোটেকশন টু এ প্রিজনার অফ ওয়ার! দু দিন হয়ে গেল। তোমরা চুপ করে থাকলে কি করে?

নীপা যেন একেবারে ধসে পড়লো।—কি হবে ডাক্তারকাকু। কোন উপায় নেই?

ডাক্তার হাজরা চিন্তিত হলেন।—ভাবতে দাও। লেট মি থিঙ্ক।

ওঁকে খুব বিব্রত দেখালো।—এখানে কেউ জানে না তো? ওঁর কলীগরা?

—না। বাবা কাউকেই সাহস করে বলতে পারেনি।

—প্রথম দিনই তাড়িয়ে দিলেই তো চুকে যেত। এসেছিল,

তাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা জানবো কি করে যে ও প্রিজনার। ডাক্তার হাজরা বললেন।

আর নীপার মনে হল, সে তো আমরাও জানি। কিন্তু ঐ অবস্থায় পড়লে তা যে সম্ভব ছিল না বোঝাবে কি করে। একটা সাহেব বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে, অত রাত্রে, তখন চিৎকার হট্টগোল হলে পাড়া-পড়শি এসে পড়তো ঠিকই, কিন্তু কি ভাবতো কে জানে। হয়তো একটা অপবাদ রটে যেত।

নীপা ধীরে ধীরে বললে, ওতো প্রিজনারদের সেই ডোরা কাটা পাজামা পরে আছে, দেখলেই তো বোঝা যায়। তাছাড়া ও ইংরিজিও জানে না। দু একটা শব্দ হঠাৎ হঠাৎ বলতে পারে।

ডাক্তার হাজরার কপালে চিন্তার রেখা পড়লো।—ইটস অলরেডি ট্যু লেট। দেরী হয়ে গেছে, অসম্ভব দেরী হয়ে গেছে।

নীপা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, তখন ভেবেছি, লোকটাকে তাড়িয়ে দিলে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরবে! গলার স্বরে ঈষৎ মমতার ছাপ।

ডাক্তার হাজরা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তা হলে তো, নীপা, প্রবলেম সল্‌ভড হয়ে যেত। কথাটা ওর লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ নিয়ে নয়, তোমাদের, তোমার বাবার লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ নিয়ে। আরে, ঐ ব্যাপার নিয়েই তো কোলিয়ারির ম্যাকফার্সন সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া। দিলাম চাকরি ছেড়ে। বলেছিলাম, আই হ্যাভ ওয়ান অ্যাণ্ড ওনলি ওয়ান ইন্টারেস্ট। আমার পেশেণ্টদের সুস্থ করতে হবে, বাঁচাতে হবে। তোমার কোম্পানির কত টাকার ওষুধ খরচ বাড়ছে, আমার জানার দরকার নেই।

এসব কথা নীপা জানে, কিন্তু এখন বিরক্তিকর। মনে হল যেন আত্মপ্রচার করছেন ডাক্তার হাজরা।

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন।—সেই যে পাগলা সাহেব একটা ছেঁড়া কোটপ্যাণ্ট পরে ঘুরে বেড়াতো ভিক্ষে করতো, বিড়ি চেয়ে খেতো,

মনে আছে…সে একবার অসুখে পড়লো…

নীপা বললে, জানি, সে তো মারা গেছে।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন ডাক্তার হাজরা। উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, দাঁড়াও। ইয়েস, দাঁড়াও।

উঠে গেলেন ডাক্তার হাজরা। দেরাজ থেকে চাবি বের করলেন, দেয়ালের এক কোণে রাখা আলমারি খুললেন।

এই ঘরটায় শেলফে আলমারিতে টেবিলে নানান কোম্পানির ওষুধের স্যাম্পল রাখা আছে। সেজন্যেই হয়তো ঘরটায় ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। আর ঐ আলমারির একটা তাকে ডাক্তার হাজরার কোট প্যাণ্ট পোশাক। এক জোড়া ধোপদুরস্ত। রাত্রে কল এলে কাউকে জাগাতে হয় না, নিজেই এসে চাবি খুলে পোশাক বদলে বেরিয়ে যান।

সেই পোশাকগুলোর নীচে কি যেন খুঁজলেন।—পেয়েছি, পেয়েছি।

ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন।—ছেঁড়া তাপ্পিমারা পুরোনো প্যাণ্ট আর শার্ট। রেখে দিয়েছিলাম, সুস্থ হয়ে উঠলেই পাগলা সাহেবটাকে দেবো বলে। ব্যাটা বাঁচলো না।

নীপাকে দিলেন। বললেন, ডোরা কাটা পাজামা পরে থাকলে ইটস রিস্কি। ঐ প্রিজনারটাকে পাগলা সাহেব বানিয়ে দাও গিয়ে। এই যে শার্টটা, কেটে দিয়ে একটা তাপ্পি মেরে দিও।

নীপা বিস্মিত হয়ে বললে, তাতে কি লাভ?

ডাক্তার হাজরা বললেন, একটা অজুহাত তো হবে। এখনই যদি ওরা খবর পেয়ে চলে আসে…আমরা পাগল ভেবেছিলাম, কি সব আবোল-তাবোল বলছিল, ইটালিয়ান না পাগলামি বুঝবো কি করে! ব্যস, আজ রাতটা কাটুক। তারপর দেখি কি করা যায়। আই মাস্ট ডু সামথিং। তোমার বাবাকে বাঁচাতেই হবে। টু সেভ এ লাইফ ইজ আওয়ার মিশন। এও তো এক ধরনের জীবন বাঁচানো।

ডাক্তার হাজরা চেষ্টা করে হেসে উঠলেন।—ভয় পেয়ে গেলে

নাকি ? আরে দূর, তুমি তো মিস তুফান মেল, নার্ভাস হওয়া তোমায় সাজে না। এর জন্যে কি সত্যি সত্যি তোমার বাবার ক্যাপিটেল পানিশমেণ্ট হবে নাকি ? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। বড়জোর চাকরিতে··· আরে ধুস, ওসব কিচ্ছু না।

নীপা বাণ্ডিলটা নিয়ে বেরিয়ে এলো বিভ্রান্তের মত। অনুপমের সামনে পড়ে গেলে কি বলবে সে অস্বস্তিও নেই। ও কিছু ভাবতেই পারছে না।

বেরিয়ে এসে দেখলো অনুপম নেই। ইন্দ্র একাই দাঁড়িয়ে আছে।

ইন্দ্র বললে, অনুপমটা কোথায় যে গেল···

তারপর আস্তে আস্তে বললে, আমি পারলাম না রে। মাথাটা এমন ঘুরে গেল। আঃ কোন রকমে যদি পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কি ঝামেলা।

নীপার মাথায় তখন ডাক্তার হাজরার কথাগুলো অস্পষ্ট ভাবে ঘুরছে। তখন শুনতে ভাল লাগে নি। বলছিলেন, রুগীকে বাঁচানো তো সহজ। জীবনের অন্য ক্ষেত্রে একটাই সমস্যা। একজনকে বাঁচানো মানে অন্যের মৃত্যু। একজনের উপকার মানে অন্যের ক্ষতি। একজনের লাভ মানে অন্যের লোকসান। জাস্টিস মানে সেইসব আইন, নিয়ম, যা সমাজটাকে এ-ভাবেই চলতে দেয়। নিয়মটা একটু বদলে দিতে পারলে দুজনেই বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু কেউ বদলাতে দেবে না।

আট

গুরুদাস সারা দুপুর স্টেশন আর ঘর, ঘর আর স্টেশন করেছেন, বার বার কোয়ার্টারে এসে খোঁজ নিয়েছেন নীপা আর ইন্দ্র ফিরলো কিনা। ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তা দেখে চারুবালা বলেছেন, তুমি নিজেই গেলে পারতে। ওরা কি অত বুঝিয়ে বলতে পারবে।

গুরুদাস বিচলিতভাবে বলেছেন, ডাক্তার হাজরাকে বোধহয় না বললেই ভাল ছিল। কাজের কাজ কিছুই হবে না, উল্টে রুগী দেখতে গিয়ে হয়তো গল্প করে বসবেন। কেন যে এ দুর্বুদ্ধি হল।

চারুবালা সান্ত্বনা দিয়েছেন, ওরা আসুক না ফিরে, তুমি আগেই কেন মাথা খারাপ করছো। আমরা তো কোন পাপ করিনি, শুধু শুধু ভগবান কেন আমাদের বিপদে ফেলবে।

গুরুদাস হেসে উঠেছেন। —তুমি তোমার বিশ্বাস নিয়েই থাকো। বিটিশ গভর্নমেণ্টকে তোমার ভগবানও ভয় পায়।

একটু থেমে বলেছেন, ভগবান বোধহয় সব মানুষকেই ভয় পায়। সেকালেও রাজা উজীর, বড়লোক, গেঁয়ো পণ্ডিত সবাইকে ভয় পেতো, একালে গভর্নমেণ্টকে। সেজন্যেই এ জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ জন্মেই হয় না, পুণ্যের ফল পেতে পরজন্মে অপেক্ষা করতে হয়। আর লোকটা জানতেও পারে না গতজন্মে কি পাপ করেছিল, কতটা পুণ্য জমে ছিল।

চারুবালা বললেন, এত বিপদের মধ্যেও ভগবান নিয়ে রসিকতা করতে তোমার ভয় করছে না? ওসব বলো না তুমি, আমার বুক কাঁপছে।

গুরুদাস ক্ষোভের সঙ্গে কথাগুলো বলে ফেলেই কিন্তু ভয় পেয়ে গেলেন। বলা উচিত হয়নি। সামনে যার এত বড় বিপদ···

স্টেশনে ফিরে এলেন। বরকাখানা থেকে ফিরতি ট্রেনখানা এখনো এসে পৌঁছয়নি।

রামভজন অফিস-ঘরের দরজার কাছে একটা টুলে বসে বসে খৈনি টিপছে।

—রতনমণি, দাও হে একটা পান দাও, আজ খেতে ইচ্ছে করছে।

তারবাবু রতনমণি খুশি হলেন। কেউ পান চাইলেই উনি খুশি। জার্মান সিলভারের ডিবেটা খুলে দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে পান এগিয়ে দিয়ে বললেন, আজ আপনাকে বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে গুরুদাসদা।

গুরুদাস যেন চমকে উঠলেন। বলে উঠলেন, না না, অন্যমনস্ক কেন

বকশি বসে ছিল এক কোণে। হেসে উঠে বললে, তবে কি পেট খারাপ। বারবার কোয়ার্টারে যাচ্ছেন।

গুরুদাস ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সত্যি তো, অধৈর্য হয়ে উঠে বারবার নীপা আর ইন্দ্র ফিরেছে কিনা জানতে গেছেন। বিরজু কিংবা ভজনলালকে পাঠাতে সাহস পাননি। নীপা তো ধমক দিয়ে বিরজুর বাগানে জল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ওর অযত্নে নাকি গাছ মরে গেছে। এখন নিজেই ঝারি হাতে জল দেয়।

গুরুদাস জানেন সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো। বাইরে থেকে কোণের ঘরের জানালা দেখা যায় না, মাধবীলতার ঝোপ জাফরির গা বেয়ে উঠে ঐ জানালা আড়াল করে নেমেছে। কিন্তু বাগানে জল দিতে এলেই হয়তো বিরজুর সন্দেহ হবে, সব সময়েই জানালা দুটো বন্ধ কেন।

গুরুদাস পি ও ডবলু ক্যাম্পের দিকেও তাকাতে পারেন না, যেন ওদিকে তাকালেই কেউ বুঝতে পারবে ওঁর কোয়ার্টারে একজন প্রিজনার লুকিয়ে আছে।

—জানেন গুরুদাসদা, এ ব্যাটাদের সব বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

—কেন? কেন একথা বলছো? গুরুদাস ফিরে তাকালেন।

বকশি দাঁতে দেশলাইয়ের কাঠি খোঁচাতে খোঁচাতে বললে, প্রেস্টিজ পাংচারড হবে বলে কাউকে কিছু জানতে দেয় না। ঐ দেখুন না...

বকশি আঙুল দেখালো, একটা বড় পোস্টার সাঁটা আছে দেওয়ালে। 'গুজবে কান দেবেন না।' তার পাশেই আরেকটা। লেট আস টু দি টাস্ক...চার্চিলের বক্তৃতা।

—গুজবে কান দিলেই যে খবর জেনে ফেলবে সকলে। বকশি হাসতে হাসতে বললে।

আর রতনমণি টেলিগ্রাফে টরে টক্কা করতে করতে বললেন, আঃ কি হচ্ছে? দেওয়ালেরও কান আছে।

তারপর রতনমণি ভজনলালকে ধমক দিলে, এই, তুই এখান থেকে যা। বসে আছিস কেন?

বকশি একটু গলা নামালো। বললে, এত রাইফেল নিয়ে গার্ড দিচ্ছে, কিন্তু প্রিজনার পালাচ্ছে মাঝে মাঝেই। সেদিনও পালিয়েছে। শুনলাম, তার আগেও নাকি একবার জনকয়েক পালিয়েছিল...

গুরুদাস রীতিমত অভিনয় করলেন, দূর, তাও কি সম্ভব।

বকশি হেসে বললে, রিয়েল ফ্যাকট, গুরুদাসদা, রিয়েল ফ্যাকট।

রিয়েল ফ্যাকট কথাটা গুরুদাস নিজেও বলতেন, গার্ড হিল সাহেব সংশোধন করে দিয়েছিল একবার।

কিন্তু এই মুহূর্তে ভুল ধরার মত মন ছিল না। প্রিজনার পালিয়েছে এই কথাটা শুনেই হৃৎকম্প।

আগেও কয়েকজন পালিয়েছিল? কিন্তু পালিয়ে কোথায় গিয়েছে তারা? মেশিন গান কিংবা রাইফেলের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে হয়তো। তা হারাক, তাদের জন্যে ওঁর কোন দুঃখ নেই। শুধু এই রোবের্তো ছোকরার জন্যে কোথায় যেন একটু মায়া রয়েছে। ও যেন গুলি খেয়ে না মরে। প্রিজনার হয়ে ঐ ক্যাম্পে আবার ফিরে যাক। সে বরং ভাল।

রাত্রের ট্রেন চলে যাওয়ার পর গুরুদাস ফিরে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র বললে, বাবা দেখবে এসো, লোকটাকে একেবারে পাগল সাজিয়ে দিয়েছি। একটা পাগলা সাহেব।

একে একে সব শুনলেন ইন্দ্র আর নীপার কাছে।

তারপর নিজেই দেখতে এলেন। কিন্তু আসল সমস্যার তো কোন সুরাহা হল না। আজ রাতটাও যদি ওকে রাখতে হয়, কি যে বিপদ।

গুরুদাস ইউনিফর্ম ছেড়ে ওর ঘরে আসতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো রোবের্তো। সেই আগের মতই হাতজোড় করে নমস্কার করলো। নীপা শিখিয়ে দেওয়ার পর এখন নিখুঁত নমস্কার করতে পারে।

নমস্কার করে বললে, অনোরাতা।

নীপা তখন ওর পোশাক দেখে হাসছে।—দ্যাখো বাবা, একেবারে বদ্ধ পাগল মনে হচ্ছে।

ট্রাউজার্সে এক জায়গায় বড় একটা তাপ্পি লাগানো। বেঢপ মাপ। পায়ের বেড় এত বড় যে দেখে হাসি পায়।

ইন্দ্র হেসে বললে, ওর এখন বাঁচার একটাই রাস্তা, পাগলা গারদে।

নীপাও হাসলো।

যেন পাগল সাজিয়েছে বলেই বিপদ কেটে গেছে।

গুরুদাস বললেন, ও তো এভাবেই চলে যেতে পারে।

নীপা বলে উঠলো, না না বাবা, ডাক্তারকাকু কাল আসুন আগে। উনি নিশ্চয় কিছু একটা উপায় বাতলে দিতে পারবেন।

—যা ভাল বুঝিস্। আবার একটা রাত। গুরুদাস একটু থেমে বললেন, বকশি জেনে গেছে।

—জেনে গেছে? ইন্দ্র চমকে উঠলো।

আর গুরুদাস বললেন, প্রিজনার পালিয়েছে ক্যাম্প থেকে সে কথা জেনে গেছে। কিছু দেখে, যদি ওর সন্দেহ হয়।

রোবের্তো কিছুই বুঝছে না ওদের কথা। বোকা বোকা হাসি ওর মুখে।

' হঠাৎ এগিয়ে এলো, গুরুদাসের একটা হাত দুহাতে মুঠো করে ধরে বললে, বাব্বো। গ্রেতফুল।

—বাবা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে তোমাকে। বলছে, গ্রেটফুল। বাব্বোটা কি রে দাদা? নীপা বললে।

গুরুদাস হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। যেন প্রচণ্ড একটা অস্বস্তি। রোবের্তোর কাঁধে এমন ভাবে চাপড় দিলেন যেন সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইন্দ্রব দিকে নীপার দিকে তাকিয়ে চোখ নামালেন।—ওর মুখের দিকে তাকাতেও আমার কষ্ট হচ্ছে। তাকালেই মায়া। কি করে বাঁচাবো বল।

যেন নিজের কাছ থেকেই নিজে পালাতে চাইছেন। ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

নীপা ইন্দ্রকে চাপা গলায় বললে, বাবারই সবচেয়ে কষ্ট।

ইন্দ্র বললে, মুখে যাই বলুক বাবা, ওঁকে ধরিয়ে দিতে হবে ভেবে বাবার বুকেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট। আমি দেখতে পেয়েছি।

আর নীপা বললে, সত্যি, ও যদি কোনরকমে বেঁচে যেতে পারতো, জানিস দাদা, আমার মনে হচ্ছে আমরা সবাই বেঁচে যেতাম।

তখনই ইন্দ্র বলে উঠলো, আরে প্রিজনারের পোশাকটা যে এখানেই পড়ে আছে। দেখেছিস, ভুলেই গিয়েছিলাম।

ডোরা কাটা পাজামাটা তুলে নিল ইন্দ্র। হেসে বললে, দেখেছিস গোয়েন্দা গল্পের ক্লু পড়ে থাকছিল। কিন্তু কি করি বলতো এটা নিয়ে?

রোবের্তো তখন দু আঙুলে চিমটের মত ধরে একবার নিজের প্যান্ট একবার শার্টটা দেখালো নীপাকে। —গ্রাৎজি।

প্রথম দিন থেকে কথাটা ওর মুখে লেগেই আছে। হয়তো ধন্যবাদ ধরনের কিছু।

নীপার সত্যি অবাক লাগছে। ভয় তো রোবের্তোরই হবার কথা। প্রথম যেদিন এলো মুখ চোখে আতঙ্ক। আর এখন নীপারাই ভয়ে

অন্ধকার দেখছে। লোকটা নিশ্চিন্ত। কারো ওপর নির্ভর করলে, কাউকে বিশ্বাস করলেই বোধহয় নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

রোবের্তো চেয়ারটা এগিয়ে এনে দিল, নীপাকে বসতে বললো।

ইন্দ্র বললে, বোস না, বলছে যখন।

এখন বসতে অবশ্য নীপারও আপত্তি নেই। লজ্জা সঙ্কোচ ক্রমশ কেটে যাচ্ছে, কেমন আপন আপন লাগছে লোকটাকে।

নীপা চেয়ারে বসতেই রোবের্তোকে খুব খুশি খুশি দেখালো। এক মুখ হেসে লম্বা চেহারাটা গুটিয়ে সুটিয়ে মেঝেতে বসে পড়লো ও, প্রায় নীপার পায়ের কাছে।

নীপা অস্বস্তিতে পা দুটো পিছিয়ে নিল।

ইন্দ্র তখন ওর হাবভাব দেখে হাসছে।

রোবের্তো হঠাৎ বললে, স্তুদেন্ত ? ইন্দ্রর দিকে নীপাব দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ইউ স্তুদেন্ত ?

নীপা ঝটপট মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ। মুখে কৌতুকের হাসি।

রোবের্তোও তখন নিজের বুকে আঙুল ছুঁইয়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলছে, আই স্তুদেন্ত, কলেজিও স্তুদেন্ত।

একটা কথায় ও যেন সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিতে চাইল। যেন বলতে চাইছে ও সৈন্য নয়, গুলিবন্দুক ওর পছন্দ নয়, ও যুদ্ধ করতে চায়নি। ওর একটাই পরিচয়, ও স্টুডেণ্ট। পি ও ডবলু ক্যাম্পে ফেলে আসা খাকি গ্যাবার্ডিনের ইউনিফর্ম ওর পরিচয় নয়। লেফটেনেণ্ট কি ক্যাপ্টেন কিংবা মেজরের সমতুল্য কোন পদমর্যাদা নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা নেই। এমন কি ও নিজেকে শুধু একজন প্রিজনারও ভাবতে পারছে না। ও ছাত্র, শুধুই স্টুডেণ্ট।

ইন্দ্র আর নীপার ভাল লাগলো। যেন আমাদেরই একজন।

রোবের্তো হাসলো। —গুয়েরা ? নো। পাচে পাচে।

তারপরই মনে পড়ে যেতে বলেছে, গুয়েরা। ওয়ার। নো ওয়ার।

নীপা হেসে উঠলো।—হোয়াট ইজ পাচে? ইন্দ্রও হেসে বললে, তোমার কথা বুঝতে পারছি না চাঁদ।

ইন্দ্রর কথায় নীপা আবার হাসলো। বললে, সোনামুখ করে খুব তো হাসছো, কথা বলছো। আমাদের যে কি বিপদ, তা তো জানো না।

নীপা আবার বললে, হোয়াট ইজ পাচে?

সঙ্গে সঙ্গে রোবের্তো প্রায় গানের সুরে বলে গেল, ইন লা সুয়া ভোলেনতাতে এ নোস্ত্রা পাচে।

গানের কিংবা কথাটার মানে কি বোঝাতে চাইলো রোবের্তো। ঊর্ধ্বাহু হয়ে তর্জনী দেখালো মাথার ওপরে, ছাদ কিংবা আকাশ কিংবা তারও ওপরে ঈশ্বর হয়তো। তারপর দুহাত দুপাশে শান্ত ভাবে ছড়ালো। সমস্ত চরাচর? নীপাকে, ইন্দ্রকে, নিজেকে দেখালো।

ওরা কিছুই বুঝতে পারলো না। কি বলতে চাইছে? ঈশ্বরই আমাদের রেখেছেন, রাখবেন। নাকি তার ইচ্ছায় সব চরাচর আছে। সব ঠিকঠাক আছে, চলছে।

রোবের্তো আবার দুটো হাত দুপাশে শান্তভাবে ছড়ালো। বললে, পাচে।

নীপা হেসে উঠে বললে, সাহেব কিছু বুঝছি না। পাখির ডানা না শান্তি?

এ এক অসহ্য অস্বস্তি। দারুণ কষ্ট। একজন আরেকজনকে বুঝতে পারছে না। বুঝতে চায় তবু বুঝতে পারছে না। নীপাও তো ওকে কত কথাই বলতে চায়, বলতে পারছে না। কেউ কারো ভাষা জানে না। অথচ বুকের ভেতরটা মুখর হয়ে আছে।

নীপার তো বলতে ইচ্ছে করছে, আমরা সবাই তোমাকে বাঁচাতে চাই। বাবারও তোমার জন্যে কত মায়া, এই তো এক্ষুনি ধরা পড়ে গেছে আমাদের সামনেই। কিন্তু আমরাও যে একটা যন্ত্রের মধ্যে পড়ে আছি। তোমাকে বাঁচাতে গেলে আমরা বাঁচবো না। কিন্তু কখনো রাস্তায়, পালাতে গিয়ে যদি একটা উড়ন্ত গুলি এসে তোমার বুকে লাগে,

আমাদের হৃৎপিণ্ড ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সারা জীবন ধরে একটা অনুতাপ বয়ে যেতে হবে, একজন মানুষকে আমরা বাঁচাতে চাই নি, বাঁচাতে পারিনি।

নীপার হঠাৎ মনে হল, সত্যি আমরা তো কেউ কারো ভাষা বুঝি না। বোঝাতে পারি না। অনুপমকেই কি আমি কিছু বলতে পেরেছি? বোঝাতে চেয়েছি? অনুপমও তো আমাকে বোঝেনি।

—জীবনটাই তো পেশেন্সের খেলা। কেন বললো এ-কথা?

সমস্ত মানুষই বোধহয় এই রকম। স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারে না, মনের ভিতরের কথা বাইরে প্রকাশ করতে পারে না। ভাষা কি কিছু বলতে পারে নাকি? যত কথাই বলি না কেন, সবই ঐ রোবের্তোর সঙ্গে কথা বলার মত অস্পষ্ট। ইঙ্গিতসর্বস্ব। পৃথিবীর সব মানুষ।

রোবের্তো হঠাৎ যেন জিজ্ঞেস করলো, ভিয়া?

ইন্দ্র নীপা দুজনেই মাথা নাড়লো, না, বুঝতে পারছে না।

রোবের্তো ভুরু কুঁচকে কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে। কপালে আঙুল ঠুকলো, যেন মনে পড়ছে না।

তারপর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো সারা মুখ। বলে উঠলো, স্ত্রীত, স্ত্রীত।

—স্ট্রীট? ইন্দ্র বললে।

আর রোবের্তো খুশি হয়ে মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

—ওরে, রাস্তা খুঁজছে, পালাবে। ইন্দ্র হেসে বললে, বেরোলেই তো মরবি, ধরা পড়বি।

কিন্তু নীপা হাসতে পারলো না। ওর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠলো। ওরা তো কত কি ভেবেছে, ওকে তাড়ানো, ধরিয়ে দেওয়া, মৃত্যু। কিন্তু রোবের্তো চলে যেতে চাইছে নিজেই, এ-কথাটা একবারও ভাবেনি। ভাবেনি বলেই হয়তো ওর বুকের ভিতর কেমন একটা কষ্ট হল। চলে যাবে?

নীপা মনে মনে বলে উঠলো, অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ।

নীপার মনে হল ওর চোখে জল এসে যাবে। ও চেয়ার ছেড়ে ঝট করে উঠেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চারুবালা বারান্দায়। হাসতে হাসতে বললেন, কি এত গল্প করছিস ?

নীপা বললে, কিছু না কিছু না।

নীপার বুকের ওপর যেন একটা ভারি পাথর নেমে এসেছে।

ডাক্তার হাজরার বাড়ি থেকে ফিরে এসে ওকে পাগলা সাহেব বানানোর দৃশ্যটা মনে পড়লো।

ট্রাউজারে তাপ্পি লাগানোই ছিল, শার্টে লাগাতে ভুলে গিয়েছিল নীপা।

ট্রাঙ্ক বাকস খুঁজে পেতে এক টুকরো লাল কাপড় বের করলো। ছুঁচসুতো কাঁচি নিয়ে এলো ওর ঘরে।

ইন্দ্র ওকে শার্টটা খুলতে বললে। রোবের্তো কেবল মাথা নাড়ছে, কিছুতেই না। শেষে নীপাকে ইশারায় সরে যেতে বললে।

ইন্দ্র হেসে উঠে বললে, ওরে তোর সামনে শার্ট খুলবে না।

নীপা ফিরে এসে দেখলো, হিন্দুস্থানী ফতুয়াটা আবার পরে নিয়েছে ও।

রোবের্তোর সামনেই শার্টের বুকের কাছে খানিকটা কাপড় কাঁচি দিয়ে কেটে লাল টুকরোটা বসিয়ে দিল। এবার বদ্ধ পাগলের মত লাগছে।

ছুঁচসুতো দিয়ে সেলাই শেষ করে নীপা সুতোটা গালের কাছে টেনে নিয়ে এসে দাঁত দিয়ে কুটুস করে কাটলো। ছুঁচসুতো রেখে দিল কৌটোয়।

আর রোবের্তো তখন মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ কৌটোটা টেনে নিয়ে রোবের্তো ছুঁচ আর সুতো বের করে দিল নীপাকে।

দাঁতে সুতো কাটার ভঙ্গি করে দেখালো।

ইন্দ্র হেসে উঠলো। —আবার করতে বলছে নীপা।

নীপা লজ্জা পেয়ে গেল। —সত্যি পাগল রে!

ওর ঐ সুতো কাটার ভঙ্গিটা ভালো লেগে গেছে রোবের্তোর।

সেই সব কথা ভেবে নীপার মন খারাপ হয়ে গেল। ভিয়া, স্ত্রীত। এখন ও রাস্তার খোঁজ চাইছে। চলে যাবে। চলে যাবে ভাবতেই নীপার মন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ ইন্দ্র ডাকলো, নীপা শোন।

নীপার নিজেরও আবার ওর ঘরে যেতে ইচ্ছে করছিল। চলেই তো যাবে। বাবা শুনলেই হয়তো বলবে, তাই যাক।

নীপা ফিরে এলো ওর ঘরে। এসে দেখে ছোট্ট একটা ম্যাপ মেঝেতে মেলে ধরে রোবের্তো কি দেখাচ্ছে ইন্দ্রকে।

ম্যাপ? সেই ভাঁজ করা কাগজটা। প্যাণ্টের পকেটে লুকিয়ে ফেলেছিল নীপার সামনে। তখন বুঝতে পারেনি।

নীপাও কৌতূহলে ঝুঁকে পড়লো।

রোবের্তো ম্যাপের একটা জায়গা দেখাচ্ছে আঙুল দিয়ে। বলছে ভিয়া, স্ত্রীত?

—আরে, এ তো এখানকারই ম্যাপ। কোথাও যেতে চাইছে।

ম্যাপটার এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালো রোবের্তো। একটা ক্রশ চিহ্ন দেওয়া রয়েছে। নামগুলো সবই চেনা, ছোট ছোট জায়গা, ছোট্ট স্টেশন।

রোবের্তো আবার বললে, ভিয়া?

ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে গুরুদাস স্টেশন থেকে ফিরে এলেন। ক্লান্তি শরীরের নয়, দুশ্চিন্তার। ওসব কাজের কথা নয়। একটা সুস্থ লোককে কি পাগল বলে চালানো যায়! পাগল হলেও সাহেব দেখলেই তো যে কোন মিলিটারির লোক কথা বলবে। কথা বললেই ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া চেহারা দেখেও তো চিনতে পারবে।

লাস্ট ট্রেনের অপেক্ষায় ছিলেন গুরুদাস।

ট্রেন এলো। কামরায় দু চারজন মিলিটারির লোক ছিল। তারা কেউ নামলো না। হয়তো মুরী যাবে, কিংবা ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের হেড কোয়ার্টাসে, রাঁচিতে। প্যাসেঞ্জার সবই দেহাতি লোক।

প্লাটফর্মে পায়চারি করছিলেন গুরুদাস, আসলে ওঁর ভিতরের অস্থিরতায়।

আর তখনই একটা কামরা থেকে নামলো টি টি সি রাধেশ্যাম, সঙ্গে একটা গরীব দুঃস্থ দেহাতি লোক।

রাধেশ্যাম এগিয়ে এসে বললে, গুর্দাসজী, আপনার কি বুখারউখার কুছ হয়েছে ?

গুরুদাস বিব্রত হয়ে বলে উঠলেন, না না কিছু হয়নি। ভালই আছি। কি খবর বলুন।

রাধেশ্যাম হাসতে হাসতে দেহাতি লোকটাকে দেখালো। —ইসকো গ্যেট পার কর দিজিয়ে, টিকট নহি।

গুরুদাস ঠাট্টা করে বললেন, কত পেলে রাধেশ্যাম।

এ-রকম অনুরোধ দু'একটা শুনতে হয়। পুলিস ইনসপেক্টরটা সেবারে এসে যদি এভাবে বলতো, ছেড়ে দিতেন। লোকটা পাওয়ার দেখাতে গিয়েছিল বলেই রাগ। জি আর পিতে লোক দুটোকে হ্যাণ্ডওভার করে দিয়েছিলেন।

—কত নিয়েছো ওর কাছে বলবে তো ? গুরুদাস হাসতে হাসতে বললেন।

আর টি টি সি রাধেশ্যাম বললে, রামজীর কসম, কুছ নেহি। গুর্দাসজী, পয়সা জরুর নিই, লেকিন ডব্লু টির কাছে। এ গরিব বেচারী ট্রেনে ওঠার আগেই বললে, টিকটের পয়সা নেই, লেকিন লেড়কির বিমার।

গুরুদাস বললেন, হুঁ।

রাধেশ্যাম বললে, আদমি যখন ভরোসা রাখে, গুর্দাসজী ও কাহানী শোনেননি, শিবি রাজা তো পক্ষীর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। এই উর্দি

তো ডিউটি, লেকিন আন্দারমে আমিও ছোটাসে শিবিরাজা। বলে টি টি সি রাধেশ্যাম হো হো করে হেসে উঠলো।

গার্ডের হুইস্‌ল বেজে গেছে, সবুজ আলো নড়ছে।

ট্রেন ছেড়ে দিল, আর রাধেশ্যাম দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লো।

গুরুদাস ট্রেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ট্রেনের দিকে, নাকি টি টি সি রাধেশ্যামের দিকে।

ট্রেন মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। সিগন্যাল পড়ে ছিল, ঝটাং করে উঠে পড়লো, বুঝতে পারলেন, সবুজ আলোটা লাল হয়ে গেছে আবার।

পি ও ডবলু ক্যাম্প অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সারা আকাশ জুড়ে তিন তিনটে সার্চলাইটের তীব্র আলো পরস্পরকে কাটাকুটি করে অন্ধকারে ঘুরছে। তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজছে।

গুরুদাস নিজেও যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

রাধেশ্যামের কথাগুলো ঘুরছে ওঁর মাথার মধ্যে। আদমি যখন ভরোসা রাখে···শিবিরাজা তো পক্ষীর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। এই উর্দি তো ডিউটি, গুরুদাস নিজের বুশ কোর্টের বুকে হাত দিলেন, লেকিন আন্দারমে আমিও ছোটাসে শিবিরাজা।

—বাবা, লোকটা আমাদের বিশ্বাস করেছে, ভাবছে আমরা ওকে বাঁচাবো।

নীপার কথাগুলো মনে পড়লো।

গুরুদাস দেখতে পাচ্ছেন। লোকটা নীলডাউন হয়ে ওঁর সামনে জোড়হাত করে কি যেন বলছে। করুণ প্রার্থনার মত।—অনোরাতা। আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখাচ্ছে। হয়তো ঈশ্বরকে।

গুরুদাস ভাবলেন, ন্যায় অন্যায়ের বিচারক তো আমরা নই। কোন অপরাধ কত বড় সে বিচার করার শক্তি কি আছে আমাদের? আমরা শুধু জানি একটা মানুষ বাঁচতে চাইছে। নির্ভর করে আছে।

ওকে বাঁচানো ছাড়া এখন আর কোন উপায়ও নেই।

নয়

ভোর সকালেই টাঙার আওয়াজ শুনতে পেলেন গুরুদাস। ঘোড়ার খুরের শব্দ। নীপাও শুনতে পেয়েছিল। ও জানালায় উঁকি দিয়ে দেখেই বলে উঠলো, বাবা, ডাক্তারকাকু।

ওর গলার স্বরে উচ্ছ্বাস। যেন উনি এলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এরই নাম নির্ভরতা। রোবের্তো হয়তো ঠিক এভাবেই ওদের ওপর নির্ভর করে আছে।

টাঙাটা এসে দাঁড়ালো বাগানের ফটকের সামনে। মাধোলাল নেমে দাঁড়ালো।

আর নীপা ততক্ষণে ফটকের সামনে। কিন্তু একটাও কথা বললো না।

ডাক্তার হাজরা এলেন। ওষুধের বাক্সোটা নামিয়ে রাখলেন। গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলছে। মুখে একটা থমথমে ভাব।

এক গ্লাস জল চাইলেন। নীপা দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এল। যেন ওঁকে খুশি করতে পারলেই সব সুরাহা হয়ে যাবে।

গুরুদাস ডেকচেয়ারটা এগিয়ে দিলেন। —আরাম করে বসুন এখানে।

চারুবালাও এসে কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়েছেন।

সকলের মুখেচোখেই কেমন একটা বিনীত তোষামোদের ভাব।

এই ডাক্তার হাজরার সঙ্গে বহু দিনের ঘনিষ্ঠতা। একেবারে যেন একই পরিবারের লোক। প্রায়ই আসা-যাওয়া। একজনের বিপদে আরেকজনের উদ্বেগ। দীর্ঘদিন ধরে একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

তবু একটা বিপদে পড়লেই মানুষ কেমন বদলে যায়। ডাক্তার

হাজরা কিংবা তাঁর স্ত্রী যখনই বেড়াতে এসেছেন, একটা স্বাভাবিক আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়েছেন। কিন্তু এখন ব্যবহারটা আর স্বাভাবিক নেই। কোথায় যেন একটা খুশি করার চেষ্টা।

ডাক্তার হাজরা অবশ্য তা লক্ষ্যও করলেন না। ঢকঢক করে জলটা খেলেন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, গুরুদাসবাবু, অনেক ভাবলাম কাল রাত্রে। একজনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে আরেকজন বাঁচতে পারে না। সে বাঁচা মৃত্যুর সামিল। ইফ ইউ লীড ওয়ান টু ডেথ...

গুরুদাস বিব্রত গলায় বলে উঠলেন, আমি অতশত ভাবতে পারছি না, ডাক্তার হাজরা। শুধু বুঝতে পারছি ওকে না বাঁচাতে পারলে আমরাও বাঁচবো না।

সঙ্গে সঙ্গে নীপার মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। —ওকেও বাঁচান ডাক্তারকাকু।

চারুবালার মুখেও হাসি। —ক'টা দিনে ছেলেটার ওপর এত মায়া পড়ে গেছে।

ডাক্তার হাজরা ধীরে ধীরে বললেন, বাঁচতে হলে এখন একটাই পথ। বাঁচাতে হবে।

—কিন্তু কি করে বাঁচাবেন ডাক্তারকাকু। নীপার গলার স্বর যেন চাপা কান্না।

ডাক্তার হাজরা বললেন, বোধহয় উপায় আছে।

গুরুদাস সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন, আছে? উপায় আছে? আমি তো শুধুই নিজের বাঁচার কথাই ভেবেছি। ওকে বাঁচাতে পারলে তবেই যে আমরা বেঁচে যাবো, একবারও মনে হয়নি।

ডাক্তার হাজরা বললেন, হ্যাঁ এখন একটাই উপায়। ওকে বাঁচাতে পারলেই সকলে বাঁচবে।

আর তখনই ইন্দ্র বললে, ও কোথায় যেন পৌঁছতে চায়, একটা

ম্যাপ দেখাচ্ছিল। সেখানে পৌঁছতে পারলেই ও বোধহয় বেঁচে যাবে।

ডাক্তার হাজরা এলেন রোবের্তোর কাছে। নতুন লোক দেখে প্রথমটা ও হকচকিয়ে গিয়েছিল, ভয় পেয়েছিল। সপ্রশ্ন চোখে সকলকে ছেড়ে নীপার দিকে তাকিয়েছিল।

নীপার মনে হল রোবের্তো যেন ওকেই বিশ্বাস করেছে। ওর বোধহয় ধারণা হয়েছে নীপা থাকতে ওর কেউ ক্ষতি করবে না।

নীপা ওকে সান্ত্বনা দিল। —ডকটর, ডকটর। স্টেথিসকোপটা দেখালো। তারপর বললে, ফ্রেণ্ড।

রোবের্তো হেসে উঠলো, সরল বালকের হাসি। হাতজোড় করে নমস্কার করলো।

আর ইন্দ্র ওর পকেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ম্যাপ। ভিয়া, স্ত্রীত।

ম্যাপটার ওপর ডাক্তার হাজরাও ঝুঁকে পড়লেন।

আর ক্রশ চিহ্ন দেওয়া জায়গাটা দেখালো রোবের্তো। ডাক্তার হাজরা বলে উঠলেন, আরে এ তো ভুরকুণ্ডা। খুব ছোট্ট স্টেশন, ডাল্টনগঞ্জের দিকে।

রোবের্তো তাঁর মুখের দিকে তাকালো। বললে, ত্রেস্তি।

ওরা কিছুই বুঝলো না।

রোবের্তো ভুরু কুঁচকে কি যেন মনে করার চেষ্টা করলো। তারপর উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠলো ত্রেন, ত্রেন।

—ট্রেন বলছে।

হয়তো ঐ স্টেশনে ট্রেনে উঠবে, কোথাও নেমে যাবে। সেখানে গেলেই ও হয়তো মুক্ত। হয়তো আশ্রয় পাবে। বেঁচে যাবে।

আসলে এদিকের ট্রেনে তো উঠতে পারবে না, উঠলেই ধরা পড়ে যাবে। ওদিকটা একেবারে জঙ্গল। খনিটনি এখনো হয়নি, কয়লা খাদ নেই। শুধুই দেহাতি লোকজন। প্যাসেঞ্জার বড় একটা থাকেই

না। আশেপাশে এখনো গভীর বন। হয়তো ওখানেই কোন আশ্রয় আছে। তা না হলে ম্যাপ কেন।

গুরুদাস বললেন, ভাষা জানে না, ইংরেজ কিংবা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বলে চালাতেও পারবে না নিজেকে।

আর ডাক্তার হাজরা বললেন, আমি সে কথা ভেবেছি। একটা উপায় আছে, তারপর ওর ভাগ্য।

গুরুদাস বলে উঠলেন, আমাদের চোখের আড়ালে যা হয় হোক, জানতেও পারবো না। চোখের সামনে কিছু হলে তো বুকের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে থাকবে।

বকশির কথাটা মনে পড়লো। —শুনেছেন গুরুদাসদা। প্রিজনার ক'টা কেন পালাতে গিয়েছিল? ব্রিটিশ টমি একজন, কি একটা অপমান করেছিল, প্রতিবাদ করতে গেছে ওরা। তার আবার বিচার হয়েছিল, শাস্তি কিছু হত। কে জানে গুলি করে মেরেই দিত কিনা। চার্জ এনেছিল, রাইফেল কেড়ে নিতে যায়।

কে জানে সত্যি না মিথ্যে।

ডাক্তার হাজরা এতক্ষণ খবরটা চেপে রেখেছিলেন, কেন ভোর সকালেই ছুটে এসেছেন, তাও বলেন নি। শুনলেই ওরা ভয় পাবে। তবু না বলে পারলেন না। হঠাৎ বলে উঠলেন, গুরুদাসবাবু, কাল রাত্রে বাজপেয়ীজীর বাড়ি সার্চ হয়েছে। ঠিকাদার লাহিড়ির বাড়ি। কিন্তু কেন তা কেউ জানে না।

সবারই মুখ হঠাৎ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

রোবের্তো সপ্রশ্ন চোখে তাকালো ওদের সকলের মুখের দিকে। নাপার মুখের দিকে। তারপর আবার বললে, ভিয়া।

—ডাক্তারকাকু, ও রাস্তা জানতে চাইছে।

রোবের্তো ততক্ষণে ম্যাপের একটা জায়গা দেখালো। সেখানেও একটা চিহ্ন দেওয়া। বললে, স্ত্রীত।

ডাক্তার হাজরা বলে উঠলেন, আরে এ তো বুরাণ্ডি। বাস যায়।

ঠিকই তো, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে।

ইন্দ্র বলে উঠলো, হ্যাঁ, হ্যাঁ ওঁরাও গাঁয়ের পাশ দিয়ে। ভুরকুণ্ডার দিকেই। ঘণ্টা কয়েকের হাঁটা পথ। আমরা একবার গিয়েছিলাম।

—কিন্তু এখান থেকে ও যাবে কি করে? গুরুদাস বললেন।

আর নীপা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠলো, যুদ্ধটা যদি এক্ষুনি থেমে যেত, সব এক নিমেষেই পাল্টে যেত। না ডাক্তারকাকু? তখন তো শাস্তি হয়ে যেত। ছাড়া পেয়ে যেত সবাই।

একটু থেমে বললে, কি অদ্ভুত এই পৃথিবীটা, কি অদ্ভুত সব নিয়ম। একটা বানানো যুদ্ধ, ব্যস, মানুষকে মানুষ ভাবা যাবে না। অথচ আজই যদি যুদ্ধ থেমে যায়, শত্রুও বন্ধু হয়ে যাবে। এখন আমাদের এত দুশ্চিন্তা, তখন ভাবতেও ভাল লাগবে একটা লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছি।

নীপা সে কথাই ভাবছিল। সবই পোশাক, এক এক ধরনের ইউনিফর্ম। এখন মেজর হুইটলি ঘৃণার সঙ্গে বলে, ব্লাডি ফ্যাসিস্টস। তখন আর এসব কথা বলবে না। ঐ পিঠের ওপর ছাপটা তো মানুষের পরিচয় নয়। ওটা একটা যন্ত্র, অদৃশ্য, কিন্তু এক এক সময় তার প্রচণ্ড শক্তি। আমাদের সমাজটাও। মানুষকে কেবল দল বানিয়ে দিচ্ছে, ভাষার, ধর্মের, দেশের, আচারবিচারের, রাজনীতির। আরো কত কি। মানুষকে মানুষ থাকতে দিচ্ছে না। সব সময়েই যন্ত্রটা মানুষের পিঠে একটা ছাপ দিয়ে দিচ্ছে। একটা পোশাক পরিয়ে দিচ্ছে। যাতে তাকে মানুষ বলে কেউ চিনতে না পারে।

ডাক্তার হাজরা বললেন, ওকে বুরাণ্ডি পৌঁছে দিতে হবে। রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে হবে। তা হলেই নিশ্চিন্ত।

ডাক্তার হাজরা বললেন, নীপা, ডোণ্ট গেট নার্ভাস। তোমার ওপরই সব নির্ভর করছে।

—আমার ওপর? নীপা চমকে উঠলো। ওর গলা কেঁপে গেল।

রোবের্তো কি ভাবছিল কে জানে। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললে, ইন লা স্যুয়া ভোলেনতাতে এ নোস্ত্রা পাচে।

আজই। আজই রাত্রে চলে যাবে রোবের্তো। মুক্তির পথে। তারপরই গুরুদাসও মুক্ত। নীপা, ইন্দ্র, চারুবালা। সকলেই।

সব শুনে চারুবালার মুখ থমথম করছে।

ডাক্তার হাজরা ওঁকে শুনিয়ে শুনিয়েই সান্ত্বনা দিলেন।—আমি গিয়েই অনুপমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাববেন না, শুধু আপনার ছেলেমেয়েকেই বিপদের মুখে ঠেলে দিলাম। বিপদ ভাবলেই বিপদ। ও তো আমাদের ছেলেও হতে পারতো, তখন কি বিপদ মনে হত? বলুন আপনি।

নীপার দু'চোখে জল এসে গেল।—ডাক্তারকাকু, আপনি কি ভাল।

ডাক্তার হাজরা ওর ছেলেমানুষি আবেগে হেসে উঠলেন।

আর নীপা দৃঢ়স্বরে বললে, আমি পারবো, হ্যাঁ পারবো।

তারপর বললে, না না ডাক্তারকাকু, আমিই অনুপমকে গিয়ে বলছি। আপনি বলবেন না, আমি, আমি বলবো।

ডাক্তার হাজরা, গুরুদাস, চারুবালা নীপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ইন্দ্র বললে, আমি চললাম, রাঁচি, এই বাসেই। বিকেলের বাসেই ফিরবো। যা যা আনতে বলছেন!

ইন্দ্র চলে গেল।

নীপা এসে ঢুকলো রোবের্তোর ঘরে। এই প্রথম একা।

এসে দেখলো তাপ্পি মারা সেই শার্ট-প্যাণ্ট পরে রোবের্তো চেয়ারে বসে দু' উরুর ওপর ম্যাপটা মেলে ধরে দেখছে।

ম্যাপ, ম্যাপ, ম্যাপ। মুহূর্তের জন্যে নীপার সমস্ত শরীর যেন জ্বলে উঠলো। অকৃতজ্ঞ।

নীপা ভেবেছিল, ওকে দেখেই রোবের্তোর মুখ উৎফুল্ল হাসিতে ভরে যাবে। ওর নীল তারা চোখের মধ্যে একটা প্রতীক্ষার ছায়া দেখতে চেয়েছিল।

নীপার মনে হল, রোবের্তোর মন থেকে ও মুছে গেছে। এখন ও শুধু মুক্তির স্বপ্ন দেখছে। জীবনের স্বপ্ন।

রোবের্তো ম্যাপটা ভাঁজ করে উঠে দাঁড়ালো। চেয়ারটা দেখিয়ে বললে, সীত।

—কি আব্দার। নীপা বললে নিজের মনেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

রোবের্তো আজই চলে যাবে। চিরদিনের জন্যে। আর কখনো দেখা হবে না। নীপার বুকের মধ্যে একটা চাপা ব্যথা যেন গুমরে উঠছে। বেঁচে আছে কিনা জানতে পারবে না। নিরুদ্দেশের অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। কিংবা হঠাৎ যদি যুদ্ধ থেমে যায় নিজের দেশেই ফিরে যেতে পারবে। তখন শুধু ক্ষমা।

এই কটা দিন, নীপা বেশ বুঝতে পারছে, ওর জীবনে শুধু একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে। দেবশিশু। বাবা বলেছিল। নীল চোখ, সোনালী চুল, সরল নিষ্পাপ হাসি।

নীপার হঠাৎ মনে হল, এর সঙ্গে কথা বলার আর কোন মূল্য নেই। ও এখন শুধু একটা ম্যাপের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। পথ-ঘাট, ছোট্ট স্টেশন, গুপ্ত আশ্রয় কোন।

নীপা চলে আসছিল। রোবের্তো ডাকলো, জুলিয়েত্তা।

ফিরে দাঁড়ালো ও।

রোবের্তো মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। ওর লুটিয়ে পড়া চুলের দিকে। এগিয়ে এসে ওর চুলের গুচ্ছ হাত দিয়ে স্পর্শ করলো।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমার্কর।

কৌতুকের হাসি ঠোঁটে দুলিয়ে সপ্রশ্ন চোখে তাকালো নীপা।

—আমার্কর ? হোয়াট ইজ আমার্কর ? নীপা কৌতুকে হাসলো।

আর রোবের্তো ভুরু কুঁচকে শব্দটা খুঁজছে, খুজছে। তারপর বলে উঠলো, রিমেম…রিমেমবার।

রিমেমবার ?

কি বলতে চাইলো ও। আমি মনে রাখবো। নাকি জিজ্ঞেস করছে, তুমি মনে রাখবে কি ? কে জানে কি অর্থ।

শুধু আমার্কর কথাটা নীপার মনের মধ্যে রয়ে গেল। আমার্কর, আমার্কর।

নীপার মনের মধ্যে এখন একটা দুরন্ত সাহস এসে স্থির হয়ে আছে। এখন আর ওর কোন ভয় নেই।

গুরুদাস কিন্তু অস্থির হয়ে পড়েছেন। ভয় পাচ্ছেন।

বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, পারবি তো নীপা।

তারপর নিজের মনেই বলেছেন, আমিই তো যেতে পারতাম।

নীপা বুঝতে পেরেছে, বাবা ওদের এই বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে না। হয়তো ভাবছে, আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ছেলে-মেয়েকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছি।

কিন্তু নীপার তো ভয় করছে না। ওর বুকের ভিতরটা কি করে যেন ভয়ঙ্কর বিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে। যেন একটা দুঃসাহসিক কাজের মধ্যে নিজেকে পবিত্র করে তুলছে।

চারুবালার মুখ থমথম করছে। সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতে থাকতে হঠাৎ এক একটা কথা বলে উঠছেন।

বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। কি যে করছিস তোরা।

নীপা হেসে উঠলো, কেন মিথ্যে ভয় পাচ্ছো মা। কিচ্ছু হবে না।

একটু থেমে বললে, তোমার ছেলে তো আজ চলে যাবে।

চারুবালা কোন কথা বললেন না। ওঁর মনের মধ্যে এখন ইন্দ্র আর নীপা। এত মায়া মমতা রোবের্তোর জন্যে, ওকে বাঁচানোর গোপন ইচ্ছে, সব চাপা পড়ে গেছে দুর্ভাবনার নীচে।

হঠাৎ বললেন, খুব সাবধানে যাবি মা।

একটু থেমে বললেন, ভাবতেও আমার বুক কাঁপছে।

দুটো হাত কপালে ঠেকালেন।

গুরুদাস চিন্তিত মুখে খাকি ইউনিফর্মটা পরলেন। নীপার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর স্টেশনে চলে এলেন।

গুরুদাসের মনের মধ্যে তখন তোলপাড় চলছে।

গুরুদাস প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন। চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন।

মনে মনে ভাবলেন আমি কেন এত ভয় পাচ্ছি। কই, নীপা কিংবা ইন্দ্র তো ভয় পাচ্ছে না। ওরা তো আরো অনেক বেশি ঝুঁকি নিচ্ছে। আমাকে বাঁচানোর জন্যে। ঐ প্রিজনারটাকে না বাঁচালে আমি বাঁচবো না বলে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজের ইউনিফর্মটা দুহাতে খামচে ধরলেন। যেন ওটাই দায়ী।

হ্যাঁ, এই ইউনিফর্মটাই। ওটাই আমাদের ভয় পাওয়ায়।

গুরুদাসের মনে পড়ছে, প্রথম যেদিন বণ্ড সই করে ডি অফ আইয়ে জয়েন করলেন, এই খাকি বুশকোট আর প্যাণ্ট নিয়ে এলেন, নীপা বলছে, বাবা পরো না একবার, কেমন দেখায় দেখবো একবার।

নীপা হাসছে। চারুবালা হেসে লুটিয়ে পড়ছেন।

আর নীপা বলছে, মা ছাখো, বাবাকে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে।

অন্যরকম। ঠিকই তো।

এটাই আমাদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। আইনের মধ্যে, নিয়মকানুনের মধ্যে বেঁধে ফেলে। তখন আর তা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় থাকে না।

ইন্দ্র আর নীপা বলেছিল, সমাজ রাষ্ট্র রাজনীতি যুদ্ধ সবাইকে এক একটা ইউনিফর্ম পরিয়ে দেয়। তখন আর কেউ মানুষ থাকে না। মানুষকে মানুষ বলে চিনতে পারে না। কেবল ভয় দিয়ে শাসন করে। মানুষকে সঙ্কীর্ণ একটা গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখে। ঐ তিনতলা সমান উঁচু জাল আর কাঁটাতারে ঘেরা খাঁচাটার মত। চোখ মেলে সব কিছু দেখতে পায়, কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারে না। সে নিজেই নিজের

মধ্যে বন্দী হয়ে যায়।

সকলের গায়েই একটা করে পোশাক। ধর্মের, ভাষার, জাতির, দেশের।

ওটা না থাকলেই আমরা মুক্ত। আমরা একই পরিবারের লোক। ঐ রোবের্তোর মতই। তখন আর কেউ ঘৃণার স্বরে বলে ওঠে না, ড্যামনড ফ্যাসিস্ট। তখন কারো পিঠে কোন ছাপ থাকে না। কারো মনে কোন ভয় থাকে না।

এই তো সেদিন দেশ জুড়ে আন্দোলন হয়ে গেল। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। ডু অর ডাই। 'গুরুদাসদা, শুনেছেন, আই এন এ নাকি ইণ্ডিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে!' 'আরে রাখুন মশাই, ওরা দেশের শত্রু।'

পোশাক, রাজনীতির পোশাক।

ঐ ইউনিফর্ম পরলেই পরস্পরকে অবিশ্বাস। পরস্পরকে ভয়। সন্দেহ।

—বাবা, একদিন তো যুদ্ধ মিটে যাবে। সব বন্ধু হয়ে যাবে। তখন কি মানুষের অনুশোচনা হবে না।

রাজনীতির ছাপটাও মুছে যাবে একদিন। পোশাকের ভিতর থেকে মানুষগুলোই তো বেরিয়ে আসবে।

গুরুদাস ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙলো। সেই দেহাতি কুলিকামিনের দল কোমর জড়াজড়ি করে গান গাইতে গাইতে রেল লাইন টপকে টপকে আসছে। উদ্দাম হাসি, গান।

ধীরে ধীরে ওরা প্লাটফর্মে উঠলো। হাসাহাসি করতে করতে গান গাইতে গাইতে পার হয়ে গেল।

তাকিয়ে রইলেন গুরুদাস। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অস্ফুটে বলে উঠলেন, ব্ল্যাক গডেস।

মনে মনে বললেন, ওরা সুখী, ওদের কোন ইউনিফর্ম নেই। ওরা শুধুই মানুষ।

ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গুরুদাসের চোখ অনেক দূরে চলে গেল। একেবারে আকাশের কোলে কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের ঢেউ, নীলাভ সবুজ বনের আভাস, দূর পাহাড়ের নির্ঝরে রোদ্দুর ঠিকরে পড়া রুপোর ঝরনা। আর খোলা আকাশ।

ধীরে ধীরে অফিস-ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন গুরুদাস।

দশ

সন্ধ্যা ঘন হয়ে নামলেই এদিকটা একেবারে অন্ধকার। কোথাও কোন আলো নেই। পীচের রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায় না। রুক্ষ মাঠ, শাল মহুয়ার কুণ্ডলী, দূরের শনিচারীর হাট, কিংবা শিউজীর মন্দির— কিছুই দেখা যায় না। বড়জোর দূরের কোন ঠিকাদারের বাড়িতে পেট্রোম্যাকস জ্বলে। এদিকটায় কোন ইলেকট্রিকের আলো নেই।

রেল কোয়ার্টারের সারিও আবছা-অন্ধকারে ঢাকা। দু' একটা কোয়ার্টার থেকে খোলা জানালার ভেতর দিয়ে যেটুকু কম পাওয়ারের বালব থেকে আলো ছিটকে আসে, কিংবা প্লাটফর্ম থেকে ছড়িয়ে পড়ে।

পাশাপাশি মিলিটারি ক্যাম্প কিংবা জাল আর কাঁটাতারে ঘেরা পি ও ডবলুদের খাঁচার দিকটা আলোয় উজ্জ্বল। যতটা না আলো পড়ে, কালো ঠুলি পরানো আলো, কিন্তু দূর থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ আলোর বিন্দুগুলো দেখা যায়। আর তিনটে তীব্র সার্চ লাইট সারা আকাশ চক্র দিয়ে ঘোরে। পরস্পর পরস্পরকে কাটাকুটি করে কি যেন তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কখনো কখনো এল এম জির অকারণ গুলিবর্ষণ, কখনো অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান থেকে এক ছড়া বিদ্যুতের বর্শা অকারণেই আকাশকে ছিন্ন ভিন্ন করে।

নীপা সেই ফেলে আসা আলোর দিকেই তাকিয়ে আছে।

পীচের রাস্তা এখন নির্জন, নিঃশব্দ। অনেক পরে পরে হঠাৎ ঠিকাদারদের এক একটা লরি গর্জন করতে করতে হেড-লাইটের বিদ্যুৎ ছড়িয়ে নিমেষের মধ্যে ওদের পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হেড-লাইটের আলো পড়লেই নীপার ভয়।

পীচের রাস্তায় ক্লপ-ক্লপ, ক্লপ-ক্লপ, ধ্বনি তুলে টাঙাটা ছুটে চলেছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ। নীপার বুকের মধ্যেও। কিসের

শব্দ নীপা বুঝতে পারে না। ভয়, না অন্য কিছু।

কি সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিয়ে বসেছে ওরা। রোবের্তো বাঁচবে, বাবা বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। সে জন্যে ভয়ের সঙ্গে একটা অদ্ভুত আনন্দও যেন জড়িয়ে রয়েছে।

ডাক্তার হাজরা হঠাৎ বললেন, ডোণ্ট গেট নার্ভাস, নীপা। ভয়ের কিছু নেই। ভয় ভাবলেই ভয়।

অনুপম বললে, তুমি তো ওর নাম দিয়েছো মিস তুফান মেল। ওর আবার ভয় কি। আমরা তো আছি।

নীপার মনে হল অনুপম যেন ওর হাতখানা ছুঁয়ে বলছে, আমি তো আছি।

না, অনুপম নয়। রোবের্তোর হাত। ওর হাতের ওপর রোবের্তো হাল্কা করে তার হাতটা রাখলো। নীপা কি হাতটা সরিয়ে নেবে? রোবোর্তোর হাত কি কিছু বলতে চাইছে? ভয়ে আশ্বাস, নাকি নিজেই ভয় পাচ্ছে।

নীপা বুঝতে পারছে ওর বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ, আর অদ্ভুত বিষাদ জড়িয়ে আছে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজটা যেন ওর বুকের মধ্যে। আনন্দ, বিষাদ আর ভয় একসঙ্গে মিশে আছে।

টাঙার পিছনের আসনে বসে আছে নীপা। শক্ত হাতে হাতল ধরে আছে। আর ওর পাশেই রোবের্তো।

টাঙাটা ছুটে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে। পীচ রাস্তা ধরে।

স্টেশন, স্টেশন প্লাটফর্ম আলোয় ছায়ায় যেটুকু দেখা যায়, পিছিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ ছোট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোয়ার্টারের সারি এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

মা হয়তো এখনো দাঁড়িয়ে আছে খিড়কির দরজায়। কিছুই দেখা যাবে না, তবু। বাবা হয়তো প্লাটফর্মে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে।

সামনের রাস্তা অন্ধকার। ইন্দ্র মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে আলো ফেলছে। টাঙার আলোয় সামনের পথ স্পষ্ট দেখা যায় না।

সকলেই আবার চুপচাপ।

হেডলাইটের তীব্র আলো জ্বেলে একটা লরি বিদ্যুৎগতিতে ওদের পার হয়ে গেল।

লরিকে ভয় নেই, শুধু মিলিটারি ট্রাককেই ভয়। যদি রোবের্তোর মুখে আলো পড়ে। আলো পড়লেই কি মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারবে, বুঝতে পারবে। তবু আলো পড়লেই ভয় পাচ্ছে নীপা।

লজ্জা আর অস্বস্তি, আনন্দ আর ভয়—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

রাগে অভিমানে অনুপম যেন তখন একটা আগ্নেয়গিরি।

—শোন অনুপম, মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করো। বাইরের ব্যবহার কিংবা মুখের কথাটাই সব নয়। সে যখন হাসে, কথা বলে, তখন তার মনের মধ্যে কি চলছে তুমি জানো?

শিউজীর মন্দিরের ছায়ামাখা সিঁড়িতে বসেছিল অনুপম।

ওকে দেখেই যেন রাগে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইলো। ও খপ করে অনুপমের হাতটা ধরলো। —অনুপম, আমি, আমরা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি।

নীপার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, অনুপম উৎসুক হয়ে তাকালো। বিপদ?

—হ্যাঁ। তোমাকেও বলতে পারিনি, বলতে পাইনি।

সব শুনে অনুপম স্থির হয়ে গেছে।

নীপা বোঝাতে চেয়েছে, রোবের্তোকে বাঁচালে তবেই ওরা বাঁচবে।

আর অনুপম বলছে, আমি ওসব কিছুই জানি না নীপা, আমি শুধু তোমাকে জানি।

নীপার মুখ তখন খুশিতে ভরে উঠেছে। ধীরে ধীরে বলেছে, এ তো আমাকেই বাঁচানো। অনুপম, পারবে না তুমি?

তারপর ওরা ছুটতে ছুটতে ডাক্তার হাজরার কাছে গেছে। কুয়োতলাটার পাশ দিয়ে। দড়ি টেনে টেনে তখন দেহাতি মেয়েরা কুয়ো

থেকে জল তুলছে, শিউজীর মাথায় চড়াবে বলে।

ডাক্তারকাকু নিজেই টাঙা চালিয়ে চলেছেন। পাশে বসে আছে ইন্দ্র আর অনুপম।

নীপা ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিল, অস্বস্তি। বিশেষ করে অনুপমের সামনে।

আর অনুপম হাসতে হাসতে বলেছে, এ তো অভিনয়।

নীপা নিজেও তাই ভেবেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে শুধু অভিনয় নয়। এই মুহূর্তে রোবের্তোর পাশে বসে ওর মন এত খুশি হয়ে উঠছে কেন? রোবের্তো একটু পরেই চলে যাবে সে-কথা ভেবে ওর মন বিষাদে ভরে যাচ্ছে কেন। শুধুই কি অভিনয়।

টাঙার পিছনে বসে আছে নীপা, নীপার পাশে রোবের্তো।

নীপা তাকিয়ে আছে পিছনের ফেলে আসা রাস্তার দিকে, স্মৃতির দিকে।

সব, সব মনে পড়ছে একে একে।

ঐ তো পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়লো লোকটা। উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে বিভ্রান্তের মত। ওদের দেখে ভয় পেয়ে গেছে।

হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করছে।

আর কিছুক্ষণ। তারপর রোবের্তো চলে যাবে চিরদিনের জন্যে। আর কোনদিন দেখা হবে না। জানতেও পারবে না ও কোথায় কোন প্রান্তে আছে। বেঁচে আছে কিনা। আর যদি যুদ্ধ থেমে যায়, যুদ্ধ থেমে গেলে ও পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মিশে যাবে। পৃথিবীর যে-কোন মানুষ তখন নীপার কাছে একজনই— রোবের্তো।

ক্লপ-ক্লপ ক্লপ-ক্লপ ঘোড়ার খুরের শব্দ। টাঙাটা এগিয়ে চলেছে। সকলেই চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। যেন আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আছে সকলে।

যে-কোন মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। যে-কোন

মুহূর্তে একটা মিলিটারি জীপ কিংবা একটা অতিকায় ট্রাক এসে ওদের পথরোধ করে দাঁড়াতে পারে।

ক্রমশই অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। নীপার কাছ থেকে ঐ ফেলে আসা পি ও ডব্লু ক্যাম্প অনেক দূরে সরে গেছে। শুধু অন্ধকারের মধ্যে আলোর পুষ্পগুচ্ছ হয়ে জ্বলছে। আর সেই তিনটে তীব্র সার্চলাইটের আলো আকাশের গায়ে পরস্পরকে কাটাকুটি করছে। শত্রুপক্ষের প্লেন যদি হঠাৎ এসে পড়ে সেজন্যেই।

নীপার মনের মধ্যেও একটা তীব্র সার্চলাইট কি যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

ঐ তো লোকটা অনুনয়ের স্বরে বলছে, সেভ। মার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে হাসছে। বলছে, অনোরাতা। অনোরাতা।

নীপার ভাবতে ভাল লাগছে একটা মানুষকে বাঁচাতে পারছে ও। মানুষ, মানুষই তো, তার বেশি কিছু নয়।

ডাক্তার হাজরার স্বগতোক্তি শোনা গেল, তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। বাসটা না আগেই এসে পড়ে। সুরলিং পৌঁছলে তবেই থামবে। এখানে হাত দেখালেও থামবে না।

একটু থেমে বললেন, বাস যদি চলে যায়, তা হলেই সর্বনাশ।...

বাসটা পিছন থেকেই আসবে। কিন্তু রামগড় থেকে উঠতে সাহস পায়নি ওরা। কেউ যদি দেখে ফেলে, কেউ যদি চিনতে পারে।

অনুপম টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখে বললে, এখনো সময় আছে।

রোবের্তো বুকে আঙুল ঠুকে বলছে, ফ্রেন্দ ফ্রেন্দ। নীপার দিকে, ইন্দ্রর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ইউ ফ্রেন্দ। নীপা যেন দেখতে পাচ্ছে।

ফ্রেণ্ড। বন্ধু। সমস্ত মানুষই হয়তো পরস্পরের বন্ধু। তা না হলে রোবের্তোর জন্যে ওদের এত মায়া কেন। ও গুলি খেয়ে মরবে এই ভয়ে ওদের এত কষ্ট কেন।

মানুষ যতক্ষণ দূরে, অপরিচিত, একটা দল, ততক্ষণই তার পিঠে

একটা ছাপ, গায়ে একটা ইউনিফর্ম। বিদেশী। বিধর্মী। ওদের ভাষা অন্য। কোন্ বাংলা? কোন্ জেলা? আরো কত রকমের পোশাক। ঘরের কোণে ছুটে এলেই, আশ্রয় নিলেই, সে মানুষ।

গুরুদাস বলেছিলেন, মেজর হুইটলিকে কথাটা বলার সুযোগই পেলাম না।

সত্যি কি তাই? না, বাবারও ভিতরে ভিতরে ছেলেটার জন্যে মায়া। যদি কোন রকমে বেঁচে যায় সেই ইচ্ছে। —একেবারে বাচ্চা ছেলেরে, ইন্দ্রর মতই। কি কচি মুখ। একেবারে দেবশিশু।

নীপার মনে হচ্ছে, আসলে বাবা ওকে বাঁচাতেই চেয়েছিল। ভীতু দুর্বল মানুষের অসহায় বাসনা। তাই ওকে ধরিয়ে দেবার, খবর পৌঁছে দেবার সুযোগ তৈরি করে নিতে পারেনি। সব অজুহাত, অজুহাত। নিজের সঙ্গে নিজের প্রবঞ্চনা।

—মা ছাখো ছাখো, ওর চোখের তারা কি সুন্দর নীল। আমাদের মত কালো নয়। নীপা বলে উঠেছিল।

চারুবালা হেসেছেন। —সত্যি রে। ওদের কি করে যে অমন নীল হয়।

সুন্দর আর নীল। নীপা সুযোগ পেলেই মুগ্ধ হয়ে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতো। এখন সেটাই সবচেয়ে বড়ো ভয়। যদি কারো চোখে পড়ে।

এ সময়ে বাসে বেশি যাত্রী থাকে না। বেশির ভাগই দেহাতি ওঁরাও মুণ্ডা কুলিকামিন, কিছু গেঁয়ো চাষী। কিন্তু ভদ্রলোক কেউ থাকতেও তো পারে। আর রোবের্তো হঠাৎ যদি কোন কথা বলে ওঠে।

—লুভ্তো, লুভ্তো। রোবের্তো বলছে। নীপার চোখের দিকে ইশারা করে। চুল দেখিয়ে ইন্দ্র হাসছে। —ওর কালো চুল ভাল লাগে রে। কালো চোখ।

রোবের্তো হাতটা নীচের মুদ্রার মত ঢেউ খেলিয়ে বুঝিয়েছে, ঢেউ খেলানো লম্বা চুল ওর খুব সুন্দর লাগছে।

নীপার তখন অসীম লজ্জা। রূপের প্রশংসা করছে। তাও দাদার সামনে। কি বোকা। কি বেহায়া।

এখন মনে পড়তেই ভাল লাগলো।

—না না আমি পারবো না। ডাক্তার হাজরার কথা শুনেই নীপা বলে উঠেছিল। এত আতঙ্কের মধ্যেও ব্যাপারটা মনে হয়েছিল কি অসম্ভব, কি লজ্জার।

অনুপমের চোখের সামনে এই অভিনয়। এখন অনুপম কি ভাবছে কে জানে। ওর বুকের মধ্যে কোথাও কি একটা কাঁটা বিঁধছে!

—ঐ তো সুরলিং দেখা যাচ্ছে। এসে গেছি আমরা। ডাক্তার হাজরা বলে উঠলেন।

ইন্দ্র বললে, ঐ তো দূরে আলো। লাইম ফ্যাকটরির আলো।

ডাক্তার হাজরা টাঙা চালাতে চালাতে জিগ্যেস করলেন, বাসের হেড-লাইট দেখতে পাচ্ছো?

না। নীপা পিছনের অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে দুটো উজ্জ্বল আলোর বিন্দু খুঁজলো। পেলো না।

ক্লপ-ক্লপ ক্লপ-ক্লপ। টাঙা এসে থামল। সুরলিং বাস দাঁড়াবার জায়গায়। না, কোথাও কোন লোকজন নেই। এ সময়ে কমই থাকে।

একটা হেডলাইট দেখা গেল। হেডলাইট দেখলেই ভয়। জীপ কিংবা মিলিটারি ট্রাকও হতে পারে।

এখন আরো ভয়।

চলন্ত টাঙায় হেডলাইটের আলো পড়লেও হয়তো চিনতে পারতো না। এখন তো রাস্তার ধারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নীপার বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন করে উঠলো। একটা ছোট্ট আলোর বিন্দু দ্রুত বড় হয়ে উঠছে, বড় তীব্র আর উজ্জ্বল।

—ডাক্তারকাকু, মিলিটারি ট্রাক! নীপার গলা কেঁপে গেল।

কেউ কোন কথা বললো না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। কোথায়

পালাবে? ডাক্তার হাজরা দূরে, টাঙায় উঠে বসেছেন। যেন টাঙা চালাচ্ছেন।

ওরা নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। হেডলাইটের তীব্র আলো ক্রমশই ওদের যেন গ্রাস করছে। অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট করে তুলছে ওদের।

অতিকায় ট্রাকটা এগিয়ে আসছে।

ওরা রাস্তার ধার ঘেঁষে সরে দাঁড়ালো। এই ট্রাকগুলো মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না। হয়তো চাপা দিয়ে চলে যাবে। কিংবা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। অন্ধকারে নির্জনতায় মেয়েদের কাছে ওরা তো আরো ভয়ঙ্কর। নানা জায়গা থেকে ছুটকো দু'-একটা খবর ভেসে আসে। খবর না গুজব কে জানে।

কিন্তু এখন নীপার সে ভয়ও নেই; এখন একটাই ভয়।

নীপার হঠাৎ মনে হল ট্রাকটা যেন স্পীড কমিয়ে দিয়েছে। ক্রমশই ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।

—নীপা, তুমি আড়ালে থাকো। ওদের কোন বিশ্বাস নেই। অনুপমের গলার স্বর বিভ্রান্ত।

থরথর করে কাঁপছে নীপা। ওরা কি রোবের্তোকেই খুঁজতে বেরিয়েছে, নাকি রাঁচির দিক থেকে সৈন্য নিয়ে চলেছে।

হঠাৎ মিলিটারি ট্রাক থেকে সৈন্যদের একটা বিকট উল্লাস ভেসে এলো।

সঙ্গে সঙ্গে নীপা যেন নিজের জন্যেও ভয় পেল।

ট্রাকটা ওদের সামনে এসে পড়লো, এক্ষুনি যেন থেমে পড়বে। না, আমেরিকান সৈন্য বোধ হয়।

ওরা অশ্লীলভাবে নীপার দিকে তাকিয়ে চুমু ছুঁড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে অট্টহাস হেসে উঠলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নীপার বুকের ভেতরটা তখনো ঢিপ ঢিপ করছে। কারো মুখে

কোন কথা নেই।

নীপা তাকিয়ে দেখলো ট্রাকের পিছনে লাল আলোটা আর দেখা যাচ্ছে না।

নিশ্চিন্ত।

অন্য সময়ে হলে—ইন্দ্র, ডাক্তারকাকু, অনুপমের সামনে এই নোংরামির দৃশ্যে ও লজ্জায় মরে যেত। এখন শুধু পরিত্রাণ পেয়েছি ভেবেই নিশ্চিন্ত।

—বাস আসছে বাস। নীপা হঠাৎ বলে উঠলো।

দেখলেই চেনা যায়, জীপ বা ট্রাকের মত অতখানি তীব্র সাদা আলো নয়। হলুদ হলুদ।

লাইট পোস্টের আলোর আড়ালে অন্ধকার মেখে ওরা দাঁড়ালো। শুধু ইন্দ্র একা, আলোর নীচে।

ডাক্তার হাজরাকে দেখলে বাসের দেহাতিগুলোও চিনে ফেলতে পারে। সেজন্যেই উনি টাঙা নিয়ে পিছিয়ে গেলেন।

একজোড়া ক্রুদ্ধ চোখের মত হেডলাইট এগিয়ে আসছে, ক্রমশ বড় হচ্ছে। নীপা শ্বাস রোধ করে তাকিয়ে রইলো।

না, শুধুই একটা ঠিকাদারের লরি। মালপত্র নেই, অনেকগুলো কুলিকামিন তার পিছনে হল্লা করতে করতে পার হয়ে গেল।

নীপার এখন অবশ্য নিজের জন্যে ভয় নেই। এখন শুধু রোবের্তো।

রোবের্তো একটাও কথা বলছে না। ওকে বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। অদ্ভুত সুন্দর। কেমন যেন অন্যমনস্ক। নীপা আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো।

—নীপা, ভয় পেয়ো না। হাসবে। কেউ যেন সন্দেহ করতে না পারে। ডাক্তার হাজরা সাবধান করে দিলেন।

অনুপম হাসতে হাসতে বলেছিল, এ তো শুধু অভিনয়।

শুধু অভিনয়? নীপার বুকের ভিতরটা ক্রমশই যেন বিষাদে ভরে যাচ্ছে। রোবের্তো চলে যাবে, হারিয়ে যাবে, আর একটু পরেই।

বাস এলো। বাস থামলো।

ভিতরে দেহাতিদের কিচিরমিচির।

ইন্দ্র প্রথমেই উঠে ভিতরটা দেখে নিল। সে-রকমই কথা ছিল। যদি কোন চেনালোক থাকে, কিংবা কোন ভদ্রলোক।

—উঠে আয়।

একে একে সকলেই উঠে পড়লো। সামনের দরজা দিয়ে। যাক্, নিশ্চিন্ত। সামনের সীটগুলো খালি। ঠিক ড্রাইভারের পিছনের সীট।

রোবের্তো আর নীপা পাশাপাশি বসলো। ঠিক পিছনের সীটে ইন্দ্র আর অনুপম।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেহাতি যাত্রী জনকয়েক। বেশির ভাগই মেয়ে। পিছনের সীটে চাষী গোছের হিন্দুস্থানী মেয়েপুরুষ। ইন্দ্র ভাল করে দেখে নিল।

তাদের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠলো, দুলহন। দেহাতি মেয়েগুলো হেসে উঠলো।

নীপা নিশ্চিন্ত হল। কণ্ডাক্টরও বুঝতে পারেনি। আপ্যায়ন করে সামনের সীটে বসিয়েছে।

ইন্দ্র টিকিটের পয়সা দিয়ে বললো, বুরাণ্ডি।

কণ্ডাক্টর এত দেরী করছে কেন টিকিট দিতে। নীপার বুক দুরদুর করলো।

না, কণ্ডাক্টর টিকিট দেবার অছিলায় নীপাকেই দেখছিল। রোবের্তোকে নয়। রোবের্তো মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে।

আর তো মাত্র মিনিট পনেরোর পথ। পৌঁছলেই মুক্তি।

নীপা বলেছিল, ওর চুল দেখলেই তো চিনে ফেলবে, ডাক্তারকাকু।

ডাক্তার হাজরা হেসেছেন। নিজের মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, লুক হিয়ার, কোনদিন জানতে পেরেছো?

বলে গুরুদাসের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, অল ব্ল্যাক। কিন্তু আসলে,

বুঝলেন গুরুদাসবাবু, অল হোয়াইট।

সবাই অবাক হয়ে গেছে, হেসে উঠেছে।

নীপা দেখতে পাচ্ছে, দাদার দাড়ি কামানোর আয়নায় নিজের চুল দেখছে রোবের্তো। কালো চুল। হাসছে।

সন্থ দাড়ি কামিয়ে রোবের্তোকে তখন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। সত্যি দেবশিশু।

তারপরই হেসে লুটোপুটি সবাই।

ডাক্তারকাকু বলেছিলেন, একেবারে বর সাজিয়ে নিয়ে গেলে হয়। বর-কনে। কপালে চন্দনের টিপ, মাথায় টোপর। কি বলো নীপা।

নীপা অস্বস্তিতে, ভয় পেয়ে বলে উঠেছে, না না, আমি পারবো না। সমস্ত ব্যাপারটাকে কল্পনায় ভেবে নিয়ে হেসে ফেলেছে। —অসম্ভব।

ডাক্তার হাজরা আশ্বস্ত করেছেন, আরে না না। অতসব দরকার নেই।

ইন্দ্র ওকে ধুতি পরিয়েছে। আর তার ওপর বেল্ট বেঁধে দিয়েছে। তা না হলে ধুতি রাখতে পারবে না।

সেজন্যেই তো ইন্দ্রর রাঁচি যাওয়া।

নীপা দেখছে আর হাসছে। ধুতি পরিয়ে ওকে হাঁটা শেখাচ্ছে অনুপম। ঘরের মধ্যেই। এক একবার বারান্দায়। দু পাশের দরজায় খিল আঁটা, কেউ না হঠাৎ এসে পড়ে। প্যাণ্ট পরা লোকদের হাঁটার ছন্দই অন্যরকম, সেজন্যেই ইন্দ্রর ভয়।

রোবের্তো আদ্দির পাঞ্জাবিটা পরতেই চারুবালা দেখে বলে উঠলেন, রাজপুত্তুর রে।

নীপা মুখফুটে কিছু বলতে পারে নি। ওকে তখন অসীম লজ্জা এসে ঘিরে ধরেছে।

বাস চলেছে হু হু করে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলো নীপা। রোবের্তোর চুল উড়ছে। মুখটা জানালার দিকে রাখা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল নীপার।

কিন্তু এদিকে তাকালেই ওর নীল চোখ। ঐ সুন্দর নীল চোখই এখন আতঙ্ক।

বাসটা স্পীডে ছুটে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে।

ইন্দ্র কণ্ডাক্টরকে বললে, বুরাণ্ডিতে নামিয়ে দেবে আমাদের।

—হাঁ বাবুজী।

নীপার মনে পড়ছে। কি যত্ন করে রোবের্তোকে আজ খেতে দিয়েছে মা।

মার মুখ থমথম করছিল। নীপাদের জন্যে ভয়। কখন কি ঘটে যায়। আর রোবের্তোর জন্যে চাপা কষ্ট। নীপা বেশ টের পেয়েছে।

—ছেলেটা আজই চলে যাবে। মা বলেছিল। —আগে থেকে জানলে একটু ভালমন্দ কিছু রান্না করতাম।

থেমে গিয়ে বলেছেন, একটু মাংস আনালে হয় না?

ইন্দ্র রেগে গেছে। —এখন কত কাজ। ডিম আছে তাই দাও না, ডিমের কালিয়া করে খাওয়াও তোমার ছেলেকে। বলে রেগে যাওয়ার অনুতাপে হেসে উঠেছে।

আর চারুবালা বলেছেন, কি যে বলিস। ডিম হল অযাত্রা। ছেলেটা বিদেশ বিভুঁয়ে শেষে কিনা...

চারুবালা আর কথা শেষ করতে পারেন নি।

নীপার মনে পড়ছে। সব সব। ঐ তো রোবের্তো বলছে, স্তুদেন্ত। আই স্তুদেন্ত।

হঠাৎ নীপার তন্ময়তা ভেঙে গেল। বাসের পিছনের সীটের দেহাতি মেয়েগুলো হয়তো ওদের নিয়েই হাসাহাসি করছিল এতক্ষণ। হঠাৎ উচ্চৈস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে। কেউ হো হো করে হাসছে। কিন্তু গানটা যেন চেনা চেনা, সুর করে করে গাইছে।

ওরা যখন বাসে উঠলো, কে একজন বলে উঠেছিল, বরাত।

আরেকজন, দুলহান।

নীপা গানটা চিনতে পারলো। আরে এটা তো বাজপেয়ীজীর

মেয়ের বিয়ের সময় মেয়েরা গাইছিল। চাচীজী নথ নেড়ে নেড়ে হাসছিল গান শুনে। সেই গান। চলহে চৌপাই দুলহান বৈঠে…।

তা হলে ওরা কিছু সন্দেহ করেনি। নতুন বিয়ে হওয়া স্বামী-স্ত্রী ভেবেছে।

নীপা জানে এটা অভিনয়, নিছক অভিনয়। তবু ভাল লাগছে গানটা।

এখন আর নীপার মনে ভয় নেই। শুধু একটা কাঁটা বিঁধে থাকা ব্যথা।

অথচ, তখন কি ভয়।

ডাক্তার হাজরা বলেছিলেন, টাঙা নিয়ে আসবো, সব রেডি থাকবে। স্পীডে বেরিয়ে গিয়ে অন্ধকারে পীচ রাস্তায়।

ইন্দ্র অনুপমও সেই ধুতি পাঞ্জাবি পরেছে।

গুরুদাসকে ডাক্তার হাজরা বলেছেন, স্টেশনের কেউ যদি দেখতেও পায়, জিজ্ঞেস করে, বলে দেবেন অনুপমের বন্ধু, সিনেমা দেখতে গেল সবাই।

সে-সময় কি ভয় নীপার। কিন্তু সঙ্কোচ আর লজ্জা। কিন্তু মানুষটাকে তো বাঁচাতে হবে। তার চেয়ে বড় কথা, বাবাকে বাঁচাতে হবে, নিজেদের বাঁচতে হবে।

ভয়ে বুক কাঁপছে তখন। অথচ অস্বস্তি, লজ্জা। অনুপমের চোখের সামনে আরো।

পীচ রাস্তায় এসে পৌঁছতেই ডাক্তার হাজরা বললেন, এবার মাথায় ঘোমটা তুলে দাও নীপা। আর তো তোমার রেল কোয়ার্টারের লোক নেই।

যেন ওটাই একমাত্র বাধা।

নীপার কেন এই অস্বস্তি! অনুপমের চোখের সামনে বলেই কি! না কি সংস্কার।

—মা তোমার এত পদে পদে কুসংস্কার।

নীপা বলতো চারুবালাকে। ছোঁয়াছুঁয়ি, শিক্ষিত পরিচ্ছন্ন সাহেবও

অস্পৃশ্য। এই রোবের্তোও। ডিম খেলে অযাত্রা। চারুবালার শুধু বন্ধন চারদিকে। সংস্কারের।

অথচ রোবের্তোকে আজ ইন্দ্রর থালা-বাসনে খেতে দিয়েছেন। তার এঁটো থালা তুলে নিয়ে মায়ার চোখে তাকিয়েছেন রোবের্তোর দিকে। নীপা বুঝতে পারছে, আসলে সংস্কারটাই মানুষটাকে আড়াল করে রেখেছিল। আজ মানুষটা বেরিয়ে এসেছে।

রোবের্তোর কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়েছেন চারুবালা। তখন আর ওটাকে নীপার কুসংস্কার বলে মনে হয়নি।

কিন্তু ডাক্তার হাজরা যেই বললেন, ঘোমটা তুলে দাও মাথায়, কেউ যেন সন্দেহ না করতে পারে, নীপার হাত সঙ্কোচে আটকে গেল।

শব্দ করে হেসে উঠে বললে, পারবো না, পারবো না।

—আঃ, অমন করো না। ইটস নাথিং বাট অ্যাকটিং। কলেজে থিয়েটার করোনি কখনো ?

ডাক্তার হাজরা নার্ভাস গলায় বলে উঠেছেন, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি। এক্ষুণি কোন ট্রাকের হেডলাইট পড়বে টাঙার ওপর।

শেষ অবধি ঘোমটা টানতে হয়েছিল।

আর নীপা ভেবেছে, ছ্যাখো, আমিও তো সেই কুসংস্কারেই বাঁধা পড়ে আছি। ওর থেকে বোধহয় মুক্তি নেই।

চারুবালার মতই।

বেরোবার আগে ডাক্তার হাজরা বলেছেন, সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে নাও নীপা। লাইক এ বেঙ্গলি ব্রাইড।

সবাই হেসে উঠেছে।

নীপা বলে উঠেছে, না না।

চারুবালা বলেছেন, না না।

কিন্তু শেষ অবধি ঠাকুর ঘরে গিয়ে দোলের সময় তুলে রাখা লাল আবির নিয়ে এসেছেন। পাগল, সিঁদুর কি দেওয়া যায় নাকি। নীপারও মনে হয়েছে।

—বুরাণ্ডি বুরাণ্ডি।

কণ্ডাক্টার চিৎকার করে উঠলো।

ওরা সবাই চমকে উঠেছিল।

নীপা হাত বাড়িয়ে রোবের্তোর হাত ছুঁয়ে ইশারা করলো। ও তো বোকার মত বসেই থাকবে। বুঝতেই পারছে না এখানেই নামতে হবে।

বাস থামলো।

একে একে সবাই নেমে পড়লো।

মুক্তি। এবার সব ভয় থেকে মুক্তি। কারো মনে এখন আর কোন আতঙ্ক নেই। কি প্রচণ্ড আনন্দ।

বাস চলে গেল।

ইন্দ্র বলে উঠলো, আঃ, কতদিন পরে যেন ছাড়া পেলাম।

নীপা কোন কথাই বললো না।

অন্ধকার। লাইট পোস্টের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না।

অনুপম টর্চ ফেলে ফেলে পায়ে চলা সরু রাস্তাটা দেখতে পেল।

—ঐ তো রাস্তা। ভুরকুণ্ডা যাবার রাস্তা।

পীচ রাস্তা থেকে নেমে পায়ে চলা মেঠো রাস্তাটা চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে চলে গেলেই রোবের্তোর সেই নির্দিষ্ট স্টেশন।

অনুপম টর্চটা এগিয়ে দিল রোবের্তোকে। —টেক ইট।

আর ইন্দ্র বললে, ভিয়া।

—গ্রাৎজি, গ্রাৎজি।

রোবের্তো যেন আনন্দে আত্মহারা। ইন্দ্রকে জড়িয়ে ধরলো, অনুপমকে।

তারপর নীপার কাছে এসে ওর হাত ধরলো, ধরেই রইলো।

নীপার চোখে জল। ভাগ্যিস অন্ধকার, কেউ দেখতে পাবে না। দেখলেও কেউ বুঝবে না। অনুপম তো নয়ই।

রোবের্তো ওর হাতটা ছেড়ে মেঠো পথের দিকে দু'পা এগোলো। অন্ধকারে।

সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলো, মিকেলে, আই গো।

ইন্দ্র হাত তুললো।

তারপর রোবের্তো আবার হাত তুলে বললো, জুলিয়েত্তা।

এবার আর 'আই গো' বললো না।

একটু অপেক্ষা করে রোবের্তো আবার বললে, আরিভেদের্চি।

তারপরই হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, বলে উঠলো, আগেন।

কি বলতে চাইছে? এগেন? আবার! আবার দেখা হবে? নীপা বুঝতে পারলো না।

আর রোবের্তো দু'পা এগিয়ে এসে বললে, আমার্কর।

নীপার মনে আছে। রিমেম্বর। কথাটা রোবের্তোই বলেছিল। কি মানে? আমি মনে রাখবো, নাকি তুমি মনে রাখবে তো! নীপা জানে না। কথাটা কাকে বললো? হয়তো সবাইকে।

তবু নীপাও এতক্ষণে চিৎকার করে বলে উঠলো, আমার্কর।

সঙ্গে সঙ্গে রোবের্তো ছুটে মেঠো রাস্তায় নেমে গেল। দৌড়তে লাগলো।

ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। অন্ধকারে টর্চের আলোটা নাচতে নাচতে ছুটে যাচ্ছে। শুধু আলোটা।

আর নীপা কখন নিজেরই অজান্তে দু' হাত তুলে ওকে নিঃশব্দে বিদায় জানাচ্ছে। এমন ভাবেই হাত দুটো তোলা, যেন এই মাত্র একটা পায়রা উড়িয়ে দিল।

সবাই চুপচাপ। অনেকক্ষণ। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

—এবার ফেরার বাস। অনুপম হঠাৎ বললে।

নীপার কানেও গেল না অনুপমের কথা।

ঘোমটা খসে পড়েছে। ও যেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে।

ঘোর কেটে যেতেই রুমাল ঘষে সিঁথির আবিরটা তুলতে গিয়ে আঙুলটা থেমে গেল নীপার। সিঁদুর নয়। লাল আবির। রঙ।

সমাপ্ত